আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র

মণি বাগচি

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

ACHARYA NRIPENDRACHANDRA
A Bengali biography of Nripendra Chandra Banerjee
By Moni Bagchee

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৫৮

প্রচ্ছদ : সুবীর সেন
অঞ্জন ঘোষ

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-২৯
১এ ও ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন। কলিকাতা-৬

জন্ম ও বংশপরিচয়

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর জাতীয়তাবাদী একটি দৈনিক সংবাদপত্রে[১] তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনপ্রসঙ্গে প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল :

'নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলার রাজনীতির ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। তাঁহার ত্যাগস্বীকার এবং দান অসামান্য। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতি বিধানে বাঙ্গলার যে সাধনা তাহাতে এই দেশসেবক একটি বিশেষ পর্যায়ের প্রতীক। যখন অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত তখন গান্ধীজীর আহ্বানে, দেশবন্ধুর আহ্বানে সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মুখে যাঁহারা অকুতোভয়ে সর্বস্ব বিসর্জনের সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদেরই অন্যতম। অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের সেই বিপুল প্লাবন, মহাত্মাজীর আহ্বানে ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির আত্মপ্রকাশের সেই প্রাচুর্য আজ আর অনেকের মানসচক্ষের নিকট পরিস্ফুট নহে, বর্তমান বংশীয়গণের নিকট তাহা এখন ইতিহাস মাত্র। কিন্তু পরিবারের বহু দায়িত্ব সত্ত্বেও যেদিন দেশবন্ধুর আহ্বানে নৃপেন্দ্রচন্দ্র চট্টগ্রাম কলেজ হইতে সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়া সেই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন সেদিনকার অনুভূতি কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই, হইতে দেওয়া উচিত নহে। সেদিন তাঁহার সেই কার্য সম্বন্ধে মন্তব্যে একটি বিশিষ্ট পত্রিকায় উক্ত হইয়াছিল—**His was indeed a sacrifice!** ইহাকেই ত্যাগ স্বীকার করা বলে—কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য।

'এই ঘটনার পর দুঃখসহনের বহু পরীক্ষা তাঁহার জীবনের উপর দিয়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সরলপ্রাণ দেশসেবককে কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হইতে দেখি নাই। অসহনীয় পারিবারিক ক্লেশ তিনি এমন নিঃশব্দে সহ্য করিয়া গিয়াছেন যে বাহিরের লোকে তাহা বুঝিতেই পারে নাই। ত্যাগস্বীকারে এবং যোগ্যতায় যে মর্যাদা ও বিবেচনা তাঁহার পাওয়া উচিত ছিল, রাজনীতির অধিনায়কদের

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০শে আগস্ট ১৯৪৯। এই সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন খ্যাতনামা বিপ্লবী সাংবাদিক শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। তখন তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

নিকট হইতেও তিনি তাহা পান নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে কোনো দিন কোনোরূপ অভিমান করিতে দেখি নাই। তাঁহার চতুর্দিকে একটা আশ্চর্য রকমের নির্লিপ্ততার আবরণ ছিল। সংসারের এই সকল আঘাত তাঁহাকে যেন স্পর্শ করিতে পারিত না।

'নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে যদি বিশেষভাবে কিছু বলিতে হয়, সমাজের সম্মুখে যদি তাঁহার জীবন হইতে আদর্শরূপে কিছু স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে উল্লেখ করিব—তাঁহার নিরভিমানতা অথচ ঋজুতা, অমায়িকতা অথচ দৃঢ়তা, সর্বোপরি অকুতোভয়তা ও স্বার্থ সম্বন্ধে আশ্চর্য অনাসক্তি। রাজনীতিতে আসিয়া কিছু হইতে হইবে বা কিছু করিয়া লইতে হইবে—এই বুদ্ধিমাত্র তাঁহার মধ্যে আসে নাই। রাজনীতি তাঁহার নিকট Power Politics বা প্রভুত্বলাভের উপায়স্বরূপ ছিল না, উহা ছিল ত্যাগস্বীকার ও আত্মদানের ক্ষেত্র। মহাত্মাজীর নিকট হইতে তিনি এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাই জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি চিরকাল কর্মীই রহিয়া গিয়াছেন, নেতার পদবীর দিকে অগ্রসর হন নাই। উহার জন্য কখনো প্রলুব্ধ হন নাই। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই দেশপ্রেমের যে বীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, শেষ পর্যন্ত ত্যাগ ও সেবার মধ্যেই তাহা আপনার সার্থক পরিণতি লাভ করিয়াছে।

'অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রসমাজে, দেশসেবক হিসাবে রাজনৈতিক কর্মিসমাজে, সংবাদপত্র সম্পাদক হিসাবে সাংবাদিকসমাজে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। তিনি সকলকে গভীর স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার প্রতিও সকলে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিত। পার্থিব জগতের স্থূল সাফল্যের হিসাবে তাঁহার জীবনে যে ঘাটতি পড়িয়াছে সমসাময়িক সমাজের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহা যদি মানবজীবনের কাম্য হয়, তাহা হইলে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবন, আমরা বলিব, পরম সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়াছে।'

এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতালাভের ঠিক দুবছর পরে বাঙ্গালী মাত্র একদিনের ব্যবধানে দুজন বিশিষ্ট দেশসেবককে হারিয়েছিল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সতরই আগস্ট সত্তর বছর বয়সে লোকান্তরিত হন বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস আর তাঁর চিতাগ্নি নির্বাপিত হতে না হতে আঠারই আগস্ট পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পরলোকগমন করেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। একজনের মৃত্যু হয় কলিকাতায়, অপরজনের কলিকাতা থেকে ষোল মাইল দূরে, বৈদ্যবাটিতে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে। যদিও পুলিনবিহারী ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র দুজনে ছিলেন ভিন্ন ধর্মের দেশসেবক,' কিন্তু বোধ করি উভয়ের দেশপ্রেম

ছিল যাকে বলে নিখাদ সোনা এবং স্বার্থত্যাগে কেউ কারও চেয়ে কম ছিলেন বলে মনে হয় না। স্বাধীনতাসংগ্রামে এই দুই দেশসেবকের দান স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। দুজনের মধ্যে বহু শিষ্য মারফত যোগাযোগও ছিল। পুলিনবিহারী বাঙ্গলাতে আর নৃপেন্দ্রচন্দ্র ইংরেজিতে নিজ নিজ আত্মচরিত লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই সংসারে আমরা মাঝে মাঝে এমন মানুষের সাক্ষাৎ পাই যাঁরা নিজের জীবনকে নিজে সৃষ্টি করেন। তাঁরা সংসারের কঠিন বাধার মধ্যে নিজের জীবনের ছন্দ নির্মাণ করেন এবং চারদিকের ক্ষুদ্রতাকে অপূর্ব ক্ষমতাবলে বড় করিয়া লন। তাঁর হাতের কাছে যে কিছু উপাদান-উপকরণ পান তাই দিয়েই নিজের জীবনকে মহৎ করেন এবং তাদেরকেও বৃহৎ করে তোলেন। কবির কাব্য যেমন তাঁর প্রতিভার ফল, প্রকৃত কর্মীর কর্মকে তেমন তাঁর প্রতিভার ফল বলে আমরা গণ্য করতে পারি।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এমনি একজন আদর্শবাদী কর্মীপুরুষ।

তিনি চরিত্রবলে শক্তিমান ছিলেন। চরিত্রবলেই তিনি অনেক দুরূহ কাজ করেছেন। এই যে তাঁর চারিত্রশক্তি, এটাই ছিল সেই মহান কর্মীপুরুষের জীবনের চালক। দীপস্তম্ভের নির্নিমেষ শিখার মতো এই শক্তি নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কর্মবহুল বিচিত্র জীবনে জ্যোতির্ময় ধ্রুবনির্দেশ প্রদর্শন করেছে। এই যে চরিত্রবল এ কৌশল নয়, আস্ফালন নয়, এ ভিতরকার নির্ভীক নিশ্চল সত্যের দীপ্তি। যাঁরা তাঁর নিবিড় সংস্পর্শে এসেছেন, যাঁরা অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র অথবা দেশসেবক নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাঁরাই লক্ষ্য করতেন যে, এই দীপ্তি সেই ঋজু মানুষটির কথায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে প্রতিফলিত হ'ত। উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ এই সম্পদ প্রতিবেশ-প্রভাব দ্বারা তাঁর জীবনে সার্থকতা লাভ করেছিল। প্রতিবেশ-প্রভাবজন্যই মানুষ। সমাজ মানুষের ক্ষেত্র স্বরূপ। সমাজের গতি অনুসারে, ভাব ও প্রয়োজনের পরিণতি অনুসারে এক একজন মানুষ এক একভাবে ফুটে ওঠেন। সমাজেই প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পটভূমি এবং যে বংশে সে জন্মগ্রহণ করে সেই বংশকে সেই পটভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই গণ্য করতে হয়। আমাদের আলোচনার প্রারম্ভে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কথা তাই সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করতে হবে।

ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত মধ্যপাড়া গ্রামে ১৮৮৫ সালের ১৫ জুন তারিখে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে নৃপেন্দ্রচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতামাতার প্রথম সন্তান ছিলেন। তাঁর জন্মবৎসরটি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক

ইতিহাসে বিশেষভাবেই স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছরের শেষভাগে স্থাপিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। তাঁর যৌবনকালেই সরকারী শিক্ষকতার চাকরিতে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সেবক ছিলেন। তাঁর জীবনে এটা অর্থাৎ কংগ্রেসের জন্মবৎসরে জন্মগ্রহণ করা—একটা আশ্চর্য coincidence ছিল বললেই হয়।

বাঙ্গলার ইতিহাসে পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাঙ্গলাদেশ) বিক্রমপুর স্মরণাতীত কাল থেকেই প্রসিদ্ধ। বহু বিখ্যাত লোকের জন্মস্থান বিক্রমপুর। তরঙ্গময়ী পদ্মার তীরে অবস্থিত বিক্রমপুরের পুরবাসিগণ যে বিক্রমশালী ছিলেন তা সর্বজনবিদিত। শুধু দু'এক শতাব্দীর ইতিহাস ধরে নয়, শত শত বৎসরের এমন কি বৌদ্ধযুগের প্রভাতকাল থেকে সেখানকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ইহাই প্রতীয়মান হবে যে বিক্রমপুরের ফসল চিরকালই সোনার ফসল। বাঙ্গলার কৃষ্টি ও সম্পদের গোলাঘর। প্রাচীন এমন কি বর্তমান সভ্যতার জন্মভূমি। বিক্রমশিলার জগদ্বিখ্যাত মহাবিহারের অধ্যক্ষ বিখ্যাত বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক, মনীষী পরমতত্ত্বজ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এই বিক্রমপুরের কোলে জন্মগ্রহণ করে এখানকার ধূলিকণাকে পুণ্যরসে পরিণত করে গিয়েছেন।

বৌদ্ধযুগ ছেড়ে মুঘলযুগের দিকে তাকালেও দেখতে পাওয়া যায় যে, বিক্রমপুরের জমিতে যেমনই সোনার ফসল ফলে চলেছে, তেমনই মুঘলযুগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙ্গলার বারভূঁইয়ার মধ্যে চাঁদরায়, কেদাররায়ের বীরগাঁথা আর গৌরবমণ্ডিত ঘটনাবলী আজও মানুষের মনে মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে। তারপরে আধুনিক কালের দরজায় দাঁড়ালেও দেখা যায়, ভারতীয় নারীসমাজের কণ্ঠহার, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কুল-গৌরব কবি ও দেশপ্রেমিক সরোজিনী নাইডু, জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞান-তাপস জগদীশচন্দ্র বসু, বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাশ। চিত্তরঞ্জন ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র দুজনেই উত্তরকালে কংগ্রেসের পতাকাতলে মিলিত হয়েছিলেন। বিক্রমপুরের বিক্রম আর পদ্মার অমিত গর্জন ও দুর্বার গতি নিয়েই এখানকার যে সব সন্তানের জীবনের ছন্দ বিরচিত হয়েছিল, এ যুগে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। বিক্রমপুরের ভূ-প্রকৃতি তাঁর প্রকৃতিকে অনেকখানি গড়ে তুলেছিল।

ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বিক্রমপুর একটি উপদ্বীপ। আয়তন তিনশত বর্গমাইল। দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বদিকে মেঘনা এবং পশ্চিমে ইছামতী এই

উপদ্বীপকে বেষ্টন করে প্রবাহিত হয়েছে। আবার এই নদীগুলি থেকে উদ্ভূত হয়ে অনেক ছোট ছোট নদী ও খাল উপদ্বীপের নানা অংশে ছড়িয়ে আছে। সমগ্র ভারতবর্ষে এমন ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামাঞ্চল দ্বিতীয়টি আর নেই। বিক্রমপুরের জনসংখ্যা পঞ্চাশ বছর পূর্বে নয় লক্ষ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুর মগ, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। একালের স্বাধীনতা সংগ্রামের একাধিক বীর সন্তানকে আমরা বিক্রমপুর থেকেই পেয়েছি। সেই তালিকায় আছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি দেশপ্রেমিকগণ। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নামটিও এই তালিকাভুক্ত।

বিক্রমপুরের ভূ-প্রকৃতি এখানকার অধিবাসীদের করেছে পরিশ্রমী ও সাহসী। বিক্রমপুরে সে সময়ে খুব বেশি জঙ্গল ছিল। তারপর যেমন সব জায়গাতেই হয়ে থাকে বিক্রমপুরেও ক্রমশ লোকবৃদ্ধির জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন বসতির পত্তন হচ্ছিল। পদ্মা ও ধলেশ্বরীর ভাঙনের কালেও অনেক লোক এসে মধ্যপাড়াতে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তার ফলে গ্রামের লোকসংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার হতে থাকে। বিক্রমপুরে মুসলমান ও হিন্দু পুরুষানুক্রমে বাস করে এসেছে সম্প্রীতির সঙ্গে। বাঙ্গলার এই বর্ণাঢ্য ভূ-খণ্ডের মেরুদণ্ড এখানকার সংস্কৃতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, আর কৃষক সম্প্রদায়কে এখানকার পেশী ও স্নায়ু হিসাবে গণ্য করা যায়। বিক্রমপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অনুপম। দিগন্তবিস্তৃত নদী, দীঘি, সবুজ মাঠ সব মিলিয়ে এই উপদ্বীপকে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পৈতৃকভূমি মধ্যপাড়া গ্রামটি ক্ষুদ্র হলেও ,বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল। গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল তিন হাজার। গ্রামটির ভিতর দিয়ে অনেক খাল এঁকে-বেঁকে প্রবাহিত হয়েছে। গ্রামটির একাংশে ছিল জঙ্গল; সেই জঙ্গলের মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ঠাকুর-দার আমলে চিতাবাঘ ও বন্যশূকর বিচরণ করত। ষাট বছর আগে এই গ্রামে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পরিবার বাস করত, কিছু সংখ্যক জমিজমা আছে এমন কিছু সংখ্যক ভদ্রলোক। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পরিবার এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত বেশ কয়েক ঘর চাষীর বসতি ছিল এই গ্রামে। কয়েক ঘর তাঁতী, ছুতোর মিস্ত্রী, গোয়ালা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও এখানে ছিল।

তাঁর বংশের পরিচয় দিতে গিয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন:

"ভদ্রলোক চাষী বললে যা বুঝায় আমাদের পরিবারটি ছিল ঠিক সেই শ্রেণীর।

চাষবাস করে যা আয় হ'ত তা আমার ঠাকুর-দার আমলে বৃদ্ধি পেতে থাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে। তিনি প্রধানত তামাক ও তেলের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি তেজারতি কারবার করতেন এবং সাধারণত উপযুক্ত জামিন রেখেই জোতদারদের টাকা ধার দিতেন। তেমনি আমার মাতামহও বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি একটি জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং নিজেও একটি ছোটখাট ভূ-স্বামী ছিলেন; বহু গ্রামের মালিক ছিলেন তিনি। সেকালের গ্রামীণ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এঁরা দুজনেই—আমার পিতামহ ও মাতামহ। দাদামশাই তো ব্রাহ্মণসমাজের নেতৃস্থানীয়দের একজন ছিলেন।'[১]

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পিতামহ ও মাতামহের নাম যথাক্রমে ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়। কথিত আছে, দুজনেই বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণসমাজের প্রধান ছিলেন ও সমাজে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। ভবানীশঙ্কর অতি সামান্য অবস্থা থেকে ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি বাল্যকালে মাতুলালয়ে লালিতপালিত হয়েছিলেন। সে কালে ব্রাহ্মণসমাজে কুলীন কুলে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল যে কন্যারা বিবাহের পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পিত্রালয়ে থাকত এবং তাদের সন্তানসন্ততি পিত্রালয়েই জন্মগ্রহণ করত। এজন্য তাদের সম্মান যে খুব বৃদ্ধি পেত তা নয়, কিন্তু উপায় ছিল না, কারণ কুলীনদের চিরাচরিত প্রথা মেনে চলতেই হ'ত।

ভবানীশঙ্কর উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান নি। তখন দেশে উচ্চশিক্ষা দূরে থাকুক সাধারণ শিক্ষাই বিস্তার লাভ করে নি। কিন্তু প্রথম জীবন থেকেই তাঁর প্রবণতাটি বিশেষভাবে ব্যবসার দিকেই ছিল। লবণ, পাট, কাপড় ও তেজারতির ব্যবসায়ে তিনি অল্পকালের মধ্যেই সাফল্য অর্জন করেন। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যটি তাঁর কাছে যেন বেদবাক্যের তুল্য ছিল। কিন্তু গ্রামের সমাজের মধ্যে থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে যজনযাজন বা শাস্ত্রালোচনার পরিবর্তে তুলাদণ্ড হাতে তুলে নিলে ব্রাহ্মণেতর জাতির চক্ষে সম্ভ্রমহানির বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। তাঁ ভবানীশঙ্করের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র অধিকাংশই ছিল উত্তরবঙ্গের রংপুর জিলায় সেখানে তাঁর একটি-আধটি নয়, চৌদ্দটি ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল এবং তার কয়েক কেন্দ্র থেকে দেশ-বিভাগের পূর্ব-পর্যন্ত দুর্গাপূজার জন্য বরাদ্দ অর্থ, নারিকেল ও কাপড়

১. নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মচরিত (At the Cross-Roads)

দেশের বাড়িতে যেত। ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর তিনি আকৃষ্ট হলেন তালুকদারির দিকে এবং প্রচুর ভূ-সম্পত্তি অর্জন করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিপত্তি ও আর্থিক সৌভাগ্যের সূচনা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পিতামহের আমল থেকেই।

মধ্যপাড়ায় তিনি যে বসতবাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন সেটি বহু পরিমাণ জমির উপর অবস্থিত ছিল এবং প্রায় একটি দ্বীপের মতো সুরক্ষিত। বাড়ির তিন দিকেই খাল এবং মাঝখানে বিস্তীর্ণ বসতবাড়ি। বিক্রমপুরে অধিকাংশ গৃহেরই মাটির মেঝে, দরমার বেড়া ও টিনের চাল। অবস্থাপন্ন পরিবারও এই রকম বাড়িতেই বাস করতেন। দালানকোঠা খুব কমই ছিল। ভবানীশঙ্করের বসতবাড়ির এক একটি প্রকাণ্ড উঠানের চারদিকে চারটি বড় বড় ঘর; সেগুলি উত্তরের ঘর, দক্ষিণের ঘর, পশ্চিমের ঘর ও পূবের ঘর নামে পরিচিত ছিল। একপাশে রান্নাঘর, হবিষ্য ঘর এবং বাসন মাজা ও বাড়ির স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের জন্য একটি পুকুর ছিল। অন্দর মহল ও বাহির বাড়ির মাঝখানে ঠাকুরঘর ও বাড়ির যুবকদের জন্য একটি পৃথক ঘর। ঠাকুরঘর অতিক্রম করে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ও তার পাশেই চণ্ডীমণ্ডপ। বাড়ির সীমানা যেখানে শেষ সেখানে ছিল নৌকা লাগাবার ঘাট। সেই ঘাটে বেশ বড় বড় নৌকা লাগতে পারত। বৈঠকখানা ও চণ্ডীমণ্ডপের পাশে ফুটবল খেলার মাঠের মতো একটা ছোট জায়গা ছিল। সেখানে প্রজারা ও লোকজন জমায়েত হ'ত। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের আমলে এই মাঠে বহু জমায়েত, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যাত্রাগান ও চারণকবি মুকুন্দদাসের গানের ব্যবস্থা হ'ত। বাঙ্গলার স্বাধীনতা সংগ্রামে মুকুন্দদাসের দান সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র; বলতেন, 'অশ্বিনীবাবুর শক্তি কাজ করেছে এই মানুষটির ভেতর দিয়ে। মুকুন্দদাসের যাত্রা আর একজন বড় নেতার বক্তৃতা জনসাধারণের মনে প্রভাব-বিস্তারে ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে দিতে তুল্য-মূল্য ছিল।'

ভবানীশঙ্করের আমলে বাঁড়ুজ্যে বাড়ির বৈঠকখানা একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল মধ্যপাড়া গ্রামে। দুটি বিরাট আকারের তক্তপোষ, তার উপর আচ্ছাদন হিসাবে শাদা চাদর ও কয়েকটি তাকিয়া। তক্তপোষ দুটি কিন্তু জোড়া ছিল না, পৃথক পৃথকভাবে বিন্যস্ত ছিল। প্রধান তক্তপোষটিতে সকলের বসবার অধিকার ছিল না। এই ছিল তখনকার বিক্রমপুরের একটি সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারের বাসগৃহের ঠাট। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত পূজার সময় ভিন্ন বাইরের মহলে আসতেন না। বৈঠকখানা ও চণ্ডীমণ্ডপের পাশে ছিল একটি ফুল ও ফলের বাগান। ভবানীশঙ্কর বহু অর্থব্যয়ে এবং যত্নে এই বাগানটি তৈরি করিয়েছিলেন। বাড়িতে

বারমাসে তের পার্বণ, তাছাড়া দুর্গাপূজা হ'ত; সেজন্য ফুলের প্রয়োজন ছিল। তুলসীগাছ, বেলগাছ থেকে আরম্ভ করে পূজার প্রয়োজনীয় প্রায় সব রকম ফুলের গাছই এই বাগানে ছিল। বাগানটির উপযুক্ত তত্ত্বাবধান করার জন্য মাহিনা-করা গুটিকতক মালীও ছিল। সেই বাগান ও পাশের খাল পেরিয়ে খানিকটা দূরে একটি বড় আমবাগান—সেটার নাম ছিল গাঙ্গুলী বাগান। বাড়ির কোন নূতন বৌ যৌতুক হিসাবে পেয়েছিলেন। নানাপ্রকারের সুস্বাদু আমের গাছ ও তার নিবিড় ছায়ায় ঘেরা এই বাগানটি যেন বালক ও যুবকদের স্বর্গ ছিল। আম সুস্বাদু ছিল বটে, কিন্তু পোকায় ভরা।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পিতামহের কথা বললাম। এইবার তাঁর মাতামহের কথা। ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আরও সম্পন্ন তালুকদার। তাঁর নিবাস ছিল গাওদিয়া গ্রাম; গ্রামটি পদ্মানদীর পারে। প্রকাণ্ড দোতলা পাকা কোঠা, সেটি আগাগোড়া ইসলামীয় স্থাপত্য পদ্ধতিতে তৈরি; গোল খিলানওয়ালা ঘর, ঘরে কোন থাম ছিল না। ছাদের উপর ছিল একটি পর্যবেক্ষণ চৌকি এবং মেঝের নীচে গুমঘর। এই গুমঘরের কি ব্যবহার তা প্রাচীন কালের জমিদারবাড়ির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা ভালই জানবেন। আত্মরক্ষা ও অপরের স্বাধীনতা হরণের কাজেই সেগুলি ব্যবহৃত হ'ত বলে মনে হয়।

ত্রিলোচনের তিন কন্যা, পুত্র ছিল না। পিতার সম্পত্তিতে তিন কন্যারই সমান অধিকার ছিল, যদিও পরবর্তীকালে সে সম্পত্তির প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ত্রিলোচনের জীবদ্দশাতেই তা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর পরিবারের লোকদের দরিদ্রভাবেই দিন কাটাতে হয়েছিল। এই অবস্থা বিপর্যয়ের প্রথম কারণ দান-ধ্যান; তিনি একজন যথার্থ দাতা পুরুষ ছিলেন ও দুই হাতে দান করতেন। দ্বিতীয় কারণ, ব্যবসায়ে লোকসান। একবার পাটের ব্যবসাতে ত্রিলোচনের প্রচুর টাকা লোকসান হয়। বড় মেয়ে দিনতারিণীর বিয়ে হয়েছিল মধ্যপাড়ার পাশের গ্রাম মালপদিয়ায়। ছোট মেয়ে তরঙ্গিণীর বিয়ে হয়েছিল একটু দূরে কাঠাদিয়া গ্রামে। মেজ মেয়ে ত্রৈলোক্যতারিণীর বিয়ে হয়েছিল ভবানীশঙ্করের বড় ছেলে গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে। মেয়ের বয়স তখন চার বছর আর ছেলের বয়স তখন এগার। সেকালে বাল্যবিবাহই প্রচলিত ছিল। এই গোবিন্দচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যতারিণী ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পিতা এবং মাতা।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মা ও মাসীমারা লেখাপড়ায় উৎসাহী ছিলেন কিন্তু শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন। মা

ত্রৈলোক্যতারিণী ও মাসীমাতা দীনতারিণী ও তরঙ্গিণী তাঁদের পিতৃগৃহের প্রাঙ্গণে ধানের গোলার ভেতর বসে লেখাপড়া করতেন পাছে লোকের চোখে পড়তে হয়। ত্রৈলোক্যতারিণী বিরাশী বছর বয়সে পরলোকগমন করেন, কিন্তু তিনি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও খালি চোখে রামায়ণ-মহাভারত পড়তেন। মাসীমা দীনতারিণী নাকি বিক্রমপুরের একটি ইতিহাস লিখেছিলেন। সেটি পাওয়া গেলে বাঙ্গলা-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ হ'ত। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের গ্রামে একটি ছড়া মুখে মুখে চলত :

মুখুজ্যাদের শরৎশশী আর কুসুমকামিনী,
তারা সব হয়েছে এখন জজের কেরানী।

এই মেয়ে দুটির নাকি অপরাধ ছিল যে তারা প্রকাশ্যে পাঠশালায় লেখাপড়া করতে যেত।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পিতা গোবিন্দচন্দ্র খুব রাশভারি ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি সে আমলের এফ. এ. (ফার্স্ট আর্টস) পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে তাঁর পিতার প্রধান ব্যবসায়ক্ষেত্র উত্তরবঙ্গে চলে যান ও সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। কথিত আছে, বিদ্যালয় পরিচালনায় অথবা ছাত্রদের শিক্ষাদানকার্যে তিনি কোন ত্রুটি বা অবহেলা সহ্য করতে পারতেন না। পণ্ডিতমশাইরা নাকি তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসবেন জানলেই ভয়ে কাঁপতেন। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি কৃষ্ণনগরে বাস করেন বড় ছেলের কর্মস্থলে। তাঁর বয়স্ক বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন দীননাথ সান্যাল ও যতীন্দ্র সিংহ —প্রখ্যাত সাহিত্যিকদ্বয়। তাঁর পিতার প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন : আমার পিতা গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পরিবারের মধ্যে প্রথম যিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ঐ সময়ের কাছাকাছি ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও ঢাকা কলেজ, এই দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারী ছিল ; জগন্নাথ স্কুল ও কলেজ ছিল বেসরকারী, মুখ্যত ধনী ব্যক্তিদের দানে স্থাপিত হয়েছিল।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জন্মকালে পূর্ববঙ্গের গ্রামের সমাজজীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। অধিবাসীদের বেশির ভাগই ছিলেন সঙ্গতিসম্পন্ন এবং আচারে ও আচরণে তাঁদের মধ্যে ছিল শৃঙ্খলাবোধ। জিনিসপত্রের মূল্য খুবই কম ছিল, চাল-ডাল দুটাকা মণ আর মাছ, মাংস, ঘি ও মাখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। শাক-সবজী

প্রতি গৃহস্থের বাড়িতেই জন্মাত। প্রত্যেকের বাড়িতে দুধের জন্য গরু থাকত আর চাষবাসের জন্য থাকত যন্ত্রপাতি ও বলদ। গ্রাম্য পঞ্চায়েত গ্রামের সকল বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করত—আদালতে বা পুলিশের কাছে মামলা-মোকদ্দমা খুব কমই যেত। প্রত্যেক ঘরেই মেয়েরা চরকায় সুতা কাটতেন এবং প্রত্যেক গ্রামেই এক ঘর করে তাঁতীর বাস ছিল। তখনকার দিনে গ্রামের বাজারে ল্যাঙ্কেসায়ার ও ম্যানচেস্টারের কাপড় বা লিভারপুলের নুন আদৌ দেখা যেত না। গ্রামের ভদ্রলোকেরা মোটা ধুতি ও চাদর পরিধান করতেন, মেয়েরা ঘরে তৈরি শাড়ি ব্যবহার করতেন ; ঢাকাই ও রেশমের শাড়ি বিলাসিতা ছিল। তখন সোনা ও রূপা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না, কাগজের টাকারও প্রচলন হয় নি। বিনিময় দ্বারাই দৈনন্দিন প্রয়োজনের সাধারণ জিনিসপত্র সংগৃহীত হ'ত। গ্রামে তামার মুদ্রা ও কড়ির প্রচলন ছিল। তখন লোকে বিশ মাইল পথ অনায়াসেই হেঁটে অতিক্রম করত আর বাড়ির মেয়েরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পালকি ব্যবহার করতেন। প্রায় সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে পালকি ও বেয়ারা থাকত।

হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রীতিটাই ছিল তখনকার গ্রাম্যজীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই দুই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে যেন একটা ভ্রাতৃভাব পরিলক্ষিত হ'ত এবং একে অপরের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করতেন। অভাবের দিনে সকলের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক গ্রামেই একটা করে ধর্মগোলা থাকত এবং যাঁরা সঙ্গতিসম্পন্ন তাঁরা অপেক্ষাকৃত গরীবদের সাহায্য করতে পারলে গৌরব বোধ করতেন। অতিথিসেবা ধর্ম বলে গণ্য হ'ত এবং কোন গ্রামে কখনও কোন অতিথি অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যেত না। চণ্ডীমণ্ডপে নিয়মিত কথকতা হ'ত যার মাধ্যমে সাধারণ লোক রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে উপকৃত হ'ত।

গ্রামের মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তখন খুবই উন্নত ছিল। নানারকম ব্রত পালনের ভিতর দিয়েই তাদের শিক্ষার গোড়াপত্তন হ'ত। এজন্য তাদের খুব প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠতে হ'ত এবং তখনই পুকুরে স্নানকার্য সমাধা করতে হ'ত—দারুণ শীতের দিনেও একাজ তাঁরা হৃষ্টচিত্তেই সম্পন্ন করতেন। তারপর ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বালা, ধূপ-ধুনো দেওয়া ও চন্দন ঘষার কাজ শেষ করতেন ; কখনও বা বিশেষ কোন ব্রতের দিনে আলপনা দিতেন। এই আলপনা এক সময়ে গ্রামীণ শিল্পের পর্যায়ে গণ্য হ'ত এবং অনেক মেয়েদের হাতে এমন সব সুন্দর আলপনা ফুটে উঠত যা শিল্পসুষমায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বিশেষ

বিশেষ ব্রতের বিশেষ বিশেষ ব্রতকথা ছিল ; ঐগুলি একজন পাঠ করতেন, এবং বাড়ির আর সকলে মন দিয়ে শুনতেন। এইভাবেই গড়ে উঠত কুমারী মেয়েদের জীবন।

সংস্কৃত ও ফারসির তখন খুবই আদর ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করতেন, মৌলবীরা পাঠ করতেন ইসলামীয় শাস্ত্র। গ্রামে তখন বৈষ্ণব গুরুদের খুব সম্মান ছিল। গ্রামের অধিবাসীরা সকল ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, উচ্চ চিন্তা, প্রখর নীতিবোধ—যা বর্তমানে দুর্লভ—এই ছিল প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বিক্রমপুরের একটি গ্রামের মোটামুটি চিত্র। বারমাসে তের পার্বণ মুখরিত, সহজ ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ ও সকলরকম সঙ্কীর্ণতামুক্ত অথচ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জ্বল সরল সুন্দর পরিবেশের মধ্যেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই পরিবেশেই তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। সরল জীবন ও উন্নত চিন্তা—এই আদর্শের কোলেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন।

ছাত্রজীবন

প্রথম পর্ব

নৃপেন্দ্রচন্দ্র মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। মাতুলালয়েই তাঁর শৈশবজীবনের প্রথম চার-পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয় তাঁর দিদিমায়ের আদর-যত্নের মধ্যে। মাতুলালয়েই তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। বড় কর্তার (ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়কে পরিবারে সকলে ঐ নামেই ডাকত) নাতির অন্নপ্রাশন, কিন্তু তখন ঘটা করে অনুষ্ঠান করার মতো সঙ্গতি ছিল না দিদিমার। তাই তাঁর হাতেখড়ি অনুষ্ঠানে যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে বালক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ঘরে তৈরি চিড়ার মোয়া দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন। মাতুলালয় থেকে তাঁর পৈতৃক নিবাস মধ্যপাড়ার দূরত্ব ছিল আট মাইল। হাতেখড়ি হয়ে যাওয়ার পরেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র মাতুলালয় ত্যাগ করে মধ্যপাড়ায় তাঁর ঠাকুরমায়ের কাছে চলে আসেন। এখানে দু-তিন মাস বাড়ির পাঠশালায় পড়েন। তারপরেই তাঁর মায়ের সঙ্গে বালক নৃপেন্দ্রচন্দ্র গাইবান্ধায় তাঁর বাবার কাছে চলে আসেন। প্রকৃত শৈশবশিক্ষা তাঁর এইখানেই আরম্ভ হয়েছিল।

১৮৯০ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ছাত্রজীবনের ছিল মোট পরিধি। এর মধ্যে প্রথম দশ বছর তিনি গাইবান্ধায় অতিবাহিত করেন স্কুলের ছাত্র হিসাবে আর অবশিষ্ট কাল কলেজের ছাত্র হিসাবে ঢাকা ও কলিকাতায়। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন গাইবান্ধা রংপুর জেলার ছোট একটি মহকুমা ছিল। কাছারি, কারাগার, উচ্চ বিদ্যালয় আর মহকুমা হাকিমের আবাসস্থল ব্যতীত আর কোন কোঠাবাড়ি এখানে ছিল না। সবই খড়ের চালা। লোকসংখ্যাও ছিল নগণ্য—মাত্র এক হাজার। একটা বাজার ছিল যেখানে বিবিধ মনোহারী জিনিস, কাপড়, চামড়ার তৈরি জিনিস ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যেত। যে কয়টি স্থায়ী দোকান ছিল সেখানে বিক্রী হ'ত বাসনপত্র, হারিকেন লণ্ঠন, ছাতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। সপ্তাহে দুদিন করে একটা হাট বসত। সেখানে দুধ, মাছ, শাক-সবজী, গুড় ও দেশী ফলের বেচা-কেনা চলত। 'উত্তর বঙ্গের রংপুর জেলার অন্তর্গত গাইবান্ধায় আমার পিতৃদেব প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয়-গুলির একজন পরিদর্শক ছিলেন। যদিও বিদ্যালয়গুলি জেলা বোর্ডের অধীনে ছিল, প্রকৃতপক্ষে প্রাদেশিক সরকারই এগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেন।'

মধ্যপাড়া থেকে গাইবান্ধা যাওয়ার সময় বালক নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর স্টীমার-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এইভাবে বর্ণনা করেছেন: 'তখন কলিকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির রেলপথে কোন সংযোগ ছিল না। ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানির জাহাজের দ্বারাই এই সংযোগ রাখার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের গ্রাম থেকে আট-দশ মাইল দূরে নদীর পারে অবস্থিত একটি স্টীমার স্টেশন থেকে আমি মায়ের সঙ্গে স্টীমারে উঠলাম। বৃহদাকার সেই জলযান, তার ধূম্র-উদ্গীরণকারী বিরাট চোঙ—কাঠ ও ইস্পাতের তৈরি সেই ভাসমান প্রাসাদ, এইসব আমার বালক-মনের কল্পনাকে যেন বিশেষভাবেই উদ্দীপ্ত করেছিল। সব মিলিয়ে একটা রহস্য আর বিস্ময়। যখন স্টীমারে চড়লাম, এর ইঞ্জিনগুলি যখন দৃষ্টিগোচর হলো, তখন বুকটা কেঁপে উঠেছিল ভয়মিশ্রিত আনন্দে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে শিশুর সেই প্রথম যোগাযোগ। সে পৃথিবীটা ছিল শুধু গতি আর বেগের। তারপর স্টীমারের পাটাতনের উপর ও অন্যান্য স্থানে বিচিত্র বর্ণের সেই জনতা—বেশির ভাগ যাত্রী মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর, তাদের-সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা পুরনারী, বালক-বালিকা, চাষী ও তাদের পরিবারবর্গ, মোট-মাটারী, এবং নানা কণ্ঠের ও নানাস্বরের মিশ্রিত কলরব—সে ছিল একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য, বালক-মনকে যা সহজেই কৌতূহলী করে তুলেছিল। চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, গুড় ও কলা—যাত্রীদের এই ছিল

খাদ্য। যখন স্টীমারের সারেঙদের কণ্ঠে শুনলাম "এক বাঁও মিলে না" তখন তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়নি; তবু তাদের সেই ঐকতান মনের মধ্যে আনন্দ জাগিয়ে দিয়েছিল। পরে জেনেছিলাম ঐ বিচিত্র কথার অর্থ কি। নদীর তলদেশের গভীরতা পরিমাপ করার জন্য স্টীমার চলার সময় সারেঙরা সমস্বরে ঐরকম আওয়াজ করে থাকে। পদ্মার বিস্তীর্ণ জলরাশি, তার সফেন তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখে আমার যেন বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা ছিল না। দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর পরেও আমার মানসচক্ষে আমি সেই দৃশ্য যেন নিরীক্ষণ করছি। গোয়ালন্দ হয়ে সেখান থেকে আরও কয়েকটি স্টেশন অতিক্রম করে তিনদিন পরে সর্বশেষ যে স্টেশনে এসে স্টীমার থামল সেখান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল দশ বারো মাইল। এই পথ আমরা উঁচু নীচু কাঁচা রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ি করে অতিক্রম করেছিলাম। যে তিন দিন স্টীমারে ছিলাম সেই সময়ে আমাদের আহার্য বস্তুর মধ্যে ছিল মুড়ি, চিড়া, মিষ্টি ও ফল এবং কখনও বা ভাত, ডাল ও মাছের তরকারী। সেই দশ-বারো মাইল পথ গরুর গাড়ি করে যেতে শরীরের হাড়গোড় সব যেন ভেঙে গিয়েছিল। মধ্যযুগীয় ভ্রমণের সেই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আমি কখনও বিস্মৃত হই নি।'

পাঁচ বছর বয়সে এক বিচিত্র নতুন পরিবেশের মধ্যে এসে পড়লেন বালক নৃপেন্দ্রচন্দ্র। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামেই এলেন তিনি। যদিও গাইবান্ধা সরকারী শাসনের একটি কেন্দ্র ছিল তথাপি ইহা তখন একটি বড় গ্রাম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। একটি মহকুমায় সরকারী যে সব অফিস-কাছারী ইত্যাদি থাকা দরকার সে সবই এখানে ছিল। অধিবাসীদের মধ্যে উকিল, মোক্তার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, কবিরাজ, ছোটখাট জমিদার, বড় জোতদার, কিছুরই অভাব ছিল না। ডাকঘর ও একটি হাসপাতালও ছিল; হাসপাতালটি একজন সরকারী এ্যাসিস্টাণ্ট সার্জেনের অধীনে ছিল।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বাবা গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শক। তাঁর আবাসস্থলটি ছিল কয়েকটি খড়ের ঘরের সমষ্টি; রান্নার জন্য দুটি স্বতন্ত্র স্থান ছিল, তার মধ্যে একটি ব্যবহার করতেন তাঁর বিধবা খুড়ীমা। বাড়ির বাইরের দিকেও একটি কুটীর মতো ছিল; যেখানে অতিথি-অভ্যাগত এবং বন্ধুদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল আর ছিল ছোট্ট একটি আস্তাবল; সেখানে থাকত একটি দেশী টাট্টু ঘোড়া। এই ঘোড়ায় চড়ে গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যালয়-পরিদর্শনের কাজে যেতেন। তাঁর বাড়ি থেকে অল্পদূরে ছিল একটি ছোট্ট স্রোতস্বিনী; এটি

এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে তিস্তানদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছিল। তাঁর নিকটতম প্রতিবেশীদের মধ্যে ছিলেন উকিল, কাছারীর কেরানী, ডাক্তার ও দুই-একজন জমিদারস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁদের সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর সদ্ভাব। তাঁর সততা ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্য গোবিন্দচন্দ্র সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তখন এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ছিল শান্ত ও নিরুদ্বেগ। উৎসবের দিনে সামাজিক অনুষ্ঠানে সকলেই যোগদান করতেন। জীবনধারণ ব্যয়বহুল ছিল না। একশো টাকার কম বেতনেও গোবিন্দচন্দ্র আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই বাস করতেন।

তাঁর ছাত্র-জীবনের প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন: 'আমি স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন আমার বয়স সাড়ে পাঁচ বছর। প্রথম বছরেই পেয়েছিলাম ডবল প্রমোশন। এর ফলে আমাকে লেখাপড়ায় খুব যত্ন নিতে এবং পরিশ্রম করতে হ'ত। তখনকার দিনে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের [ম্যাট্রিক (তখন এণ্ট্রান্স) ক্লাসকে বলা হ'ত প্রথম শ্রেণী] মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষা (Middle Vernacular Examination) দেবার জন্য পাঠাবার নিয়ম ছিল। এই পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল বাঙ্গলা, অঙ্ক, ভূগোল ও ইতিহাস এবং এখনকার প্রবেশিকার পাঠ্যক্রমের মতই কঠিন ছিল। সাত থেকে নয় বছরের একজন ছেলের পক্ষে—যার বিচারবুদ্ধি কিছুমাত্র বিকাশ লাভ করেনি—ইউক্লিডের জ্যামিতি বা গণিতের দুরূহ বিষয়গুলি আয়ত্ত করা কি রকম কঠিন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। বাঙ্গলা ও ইংরেজী পাঠ্যক্রম আমি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলাম, কিন্তু অঙ্কটা ছিল আমার কাছে বিভীষিকাস্বরূপ। যদিও আমি এক সপ্তাহে বর্ণমালা শিখে ফেলেছিলাম এবং ছয়মাসের মধ্যে কঠিন বাঙ্গলা প্রাইমারগুলি পড়ে শেষ করেছিলাম, তথাপি স্কুলের প্রথম তিন বছরের স্মৃতি আমার কাছে একটি দুঃস্বপ্নের তুল্যই ছিল। ইউক্লিডের জ্যামিতিক কোণ ও ত্রিকোণ আমাকে বোঝাবার জন্য আমার বাবা অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। আমি প্রথম তিন বছর অঙ্কে পারদর্শিতা লাভ করতে পারি নি। দশবছর বয়সে যখন আমি পঞ্চম শ্রেণীতে উঠলাম তখন যেন আমার বুদ্ধিবৃত্তি সহসা বিকশিত হয়ে উঠল এবং তখন থেকে অঙ্কেও আমি ভাল ছেলেদের সমান দক্ষতা অর্জন করেছিলাম। ইতিহাস, বাঙ্গলা ও ইংরেজীতে ক্লাসের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য ছিলাম। মানচিত্র আঁকা আর একটা কঠিন বিষয় বলে আমার কাছে গণ্য হয়েছিল। সাহিত্যের বিশুদ্ধ ভাবগ্রহণে আমার বুদ্ধিটা যেন স্বচ্ছন্দে খেলত।'

ছাত্র-জীবনে ভাল শিক্ষকের কাছে পড়বার সুযোগ সকল ছাত্রের হয় না। যাদের হয় তারা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে। কারণ ছাত্রজীবনের প্রকৃত বনিয়াদটা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের হাতেই তৈরি হয়। এদিক দিয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র সৌভাগ্যবান ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন: 'আমাদের সময়ে, শিক্ষকতাবৃত্তিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এমন কয়েকজন সত্যিকারের শিক্ষক ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে স্কুল-জীবনে কয়েকজন যথার্থ দক্ষ ও স্নেহশীল শিক্ষকের কাছে পড়বার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন খুব নিয়ম-শৃঙ্খলাপ্রিয় ও শিক্ষাদানে পটু; দুএকজন ছিলেন এই ধারার ব্যতিক্রম, তাঁরা নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্ভাবিত নিজস্ব পদ্ধতিতে পড়াতেন। আমি এই দুই শ্রেণীর শিক্ষকের অধীনে পাঠ গ্রহণ করে উপকৃতই হয়েছিলাম। আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন গিরিজাকান্ত বাগচি, যিনি পরে একটি সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। তিনি এবং সংস্কৃত ও অঙ্কের শিক্ষকগণ ছিলেন উপরিউক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে স্কুল-জীবনে আমার সাহিত্যপ্রীতির জন্য আমি একজন শিক্ষকের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি বনোয়ারিলাল গোস্বামী। ইনি কবি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন সেই যুগে যখন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বাঙ্গলা সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী ছিল না, কিন্তু ভাল কবিতা, বিশেষ করে সনেট ও শ্লেষাত্মক ছড়া রচনায় তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তিনি নদীয়া-শান্তিপুরের এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন।' এঁর একটি কবিতা-সঙ্কলন নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্থানীয় উকিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব গ্রন্থাগারে যে সব বই পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন সেই তালিকায় তিনি বিশেষভাবে এই বইগুলির নামোল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে, যথা—বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, চণ্ডীচরণ সেনের টম কাকার কুটীর, নন্দকুমারের বিচার, টডের রাজস্থান। তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখনই বন্দে মাতরম্ গানটি নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আচার্য বনোয়ারিলাল গোস্বামীর মুখে মাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের কবিতা শুনে কিশোর নৃপেন্দ্রচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে যেতেন। রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসগুলিও তিনি তাঁর ছাত্র-জীবনেই পড়ে শেষ করেছিলেন। এইভাবে ঐ বয়সেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যপ্রীতিটা বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কোন রচনার সঙ্গে তাঁর ছাত্র-জীবনের এই পর্যায়ে পরিচয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে

তিনি পেয়েছিলেন কলেজ-জীবনে যখন তিনি বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। যে সাহিত্য-প্রীতির বনিয়াদ তাঁর বিদ্যালয়-জীবনে গড়ে উঠেছিল, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বলেছেন, উত্তরকালে তাঁর জীবনের নানারকম ভাগ্য-বিপর্যয়ের দিনে, সেই সাহিত্যপ্রীতি তাঁকে পথনির্দেশ করেছিল। শুধু তাই নয়, জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম যা সেই শিক্ষার প্রতি তাঁর আকর্ষণের মূলে ছিল প্রধানত তাঁর এই সাহিত্যপ্রীতি। ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করে জীবন কাটাবেন, ছাত্রদের মধ্যে সেই ভাব সঞ্চারিত করে দেবেন --এই আদর্শের বীজ নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বিদ্যালয়-জীবনেই তাঁর মধ্যে তাঁর শিক্ষকরাই বপন করে দিয়েছিলেন।

নীতিনৈতিকতা তিনি বিদ্যালয়ে যেমন শিক্ষা করেছিলেন, তেমনই এটি তিনি বিশেষভাবে শিক্ষা করেছিলেন তাঁর মা ও বাবার কাছ থেকে, একথা নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজেই বলেছেন। তাঁর বিদ্যালয়-জীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা হ'ত। সেই উপলক্ষে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হ'ত শিক্ষক ও ছাত্রদের মিলিত প্রয়াসে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে-ছিলেন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর প্রিয়তম আচার্য বনোয়ারিলাল গোস্বামীর উৎসাহে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখে ঐ অনুষ্ঠানে পাঠ করেছিলেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল: 'ভারতে ইংরেজ শাসনের সুফল'। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: 'ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আমার আলোচনায় খুব খুশি হয়েছিলেন, কারণ ঐ প্রবন্ধটিতে ব্রিটিশ রাজের প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তিই অভিব্যক্ত হয়েছিল'। আর একবার (তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্র এবং ক্লাসের প্রথম ছাত্র বলে গণ্য হতেন) আর একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এলেন। তিনি ছাত্রদের একটি ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ পড়তে বলেন। প্রবন্ধটির নাম 'On the Art of Living with Others' এবং এটি তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে সে বছর ঐ প্রবন্ধটি বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ছিল না। কিন্তু নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধটি পড়া ছিল; তাই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তিনি অতি সুন্দরভাবেই সেটি পড়তে পেরেছিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গি ও ইংরেজী উচ্চারণের বিশুদ্ধতা দেখে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন এবং স্কুলের পরিদর্শকের খাতায় এর উল্লেখ করে তাঁর খুব প্রশংসা করেন। তখনকার দিনে একজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর কাছ থেকে এইরকম প্রশংসা লাভ করা, লাখ টাকা পাওয়ার সমতুল্য ছিল—এই কথা উত্তরকালে বলতেন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের।

কিন্তু তাঁর স্কুল-জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্প। গাইবান্ধার ইতিহাসে এই ভূমিকম্প স্মরণীয় হয়ে আছে। সেদিন ছিল শনিবার, এপ্রিল মাস। বেলা তখন চারটা হবে। হঠাৎ সমস্ত গাইবান্ধা গ্রামটি যেন প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল। স্কুল দেড়টার সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নতুবা ছাত্রদের অনেককেই ভূমিকম্পের কবলে পড়তে হ'ত। এই ভূমিকম্পটা সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামে হয়েছিল। ভূমিকম্পের এমনই প্রকোপ ছিল যে জমির উপর ১৫, ২০ অথবা ৩০ ফুট চওড়া ফাটল দেখা দিয়েছিল; সেই সব ফাটলের ভেতর থেকে গন্ধকের ধোঁয়া, বালি ও প্রচণ্ডবেগে জলের ধারা নির্গত হয়ে যেন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করেছিল।

'বেলা চারটার সময়ে আমরা বাড়িতে একটি শোবার ঘরে বসে ছিলাম। বাড়ির সব ঘরই ছিল কাঁচা। বাবা বৈঠকখানা ঘরে নথিপত্র নিয়ে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময়ে আমাদের মাথার উপরে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘর্ঘর আওয়াজে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। মনে হ'ল খড় ও বাঁশের তৈরি ছাদের উপর যেন একদল দৈত্য প্রচণ্ডভাবে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। তারপরেই আমাদের চারদিকে পায়ের নীচের মাটি কেঁপে উঠে দুলতে লাগল। তখন ঠিকভাবে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না, অনেকে ঘুরে পড়ে গেল, কেউ বা এদিক-ওদিক ছুটতে আরম্ভ করল। বাবা তখন সাবধান করে দিয়ে বললেন, এ ভূমিকম্প। তখন আমরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। এই ভূমিকম্পের স্মৃতি আমার চিরকাল মনে ছিল।

'ভূমিকম্পটা এমন আকস্মিক আর প্রচণ্ড ছিল যে অনেক বয়স্ক লোকের মাথা ঠিক ছিল না এবং তাঁরা তাঁদের স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও অন্যান্য পরিজনদের কথা ভুলে গিয়ে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে চলে গেলেন। তারপর কম্পন যখন থেমে গেল লোকজন তখন ধাতস্থ হয়ে চিন্তা করতে লাগল এখন কি করা উচিত। খবর পাওয়া গেল কাছারীবাড়ি, জেলখানা ও স্কুলবাড়ির বেশ ক্ষতি হয়েছে আর জমির ওপর সর্বত্র প্রশস্ত ও দীর্ঘ ফাটল দেখা গিয়েছে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার কম্পন দেখা দিল এবং সকলেই সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করলেন যে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়ে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে। ভূমিকম্পের ফল যে এমন মারাত্মক হতে পারে, আমার কেন, অনেক বয়স্কদেরও সে ধারণা ছিল না।

'তারপর কয়েকদিনের মধ্যে ব্যাপক ক্ষতি ও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গেল।

তখন সংবাদপত্র বলতে শুধু ছিল সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজি কাগজ 'বেঙ্গলি', বাঙ্গলা 'হিতবাদী' ও 'বঙ্গবাসী' আর কলিকাতা থেকে প্রকাশিত দু-একখানা বাঙ্গলা কাগজ। তখন বেতার ছিল না। তাই ভূমিকম্পের ফলে ক্ষতির সম্পূর্ণ সংবাদ জানতে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক ছিল। রংপুর জেলার সদরে ও অন্যান্যস্থানে এবং আসামে ক্ষতির পরিমাণ ছিল খুব বেশি। বহুলোকের প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায়। এই ভূমিকম্পের জের ছয় মাস ধরে চলেছিল এবং মাঝে মাঝেই কম্পন অনুভূত হ'ত যদিও তার মাত্রা প্রথমবারের মতো তত তীব্র ছিল না। এর পর সেপ্টেম্বর মাসে বাবা একটা বড় নৌকা ভাড়া করেন এবং সেই নৌকায় চড়ে আমরা ব্রহ্মপুত্রের একটা স্টীমার স্টেশনে আসি ও সেখান থেকে গোয়ালন্দ হয়ে আমরা আমাদের স্বগ্রাম মধ্যপাড়ায় ফিরে আসি।'

নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন গাইবান্ধা স্কুলের ছাত্র তখন একবার এখানকার মহকুমা হাকিমের পদে স্বনামধন্য যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে একজন সুপণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে তাঁর খুব নাম ছিল। বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ আন্দোলন করেছিলেন সেই সময়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয় যুবক ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এক বিধবা কন্যাকে বিবাহ করে সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'সাহিত্যে তাঁর আশ্চর্য দখল ছিল এবং ইংরেজি সাহিত্য থেকে তিনি অনেক অনুবাদ করে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়। একটা ইংরেজি বই থেকে ব্রিটিশ শাসন ও কূটনীতির বৈষম্য প্রাঞ্জল বাংলায় উদ্ঘাটন করেছিলেন। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এটা কম সাহসের কাজ ছিল না। স্থূলকায় ও উন্নত-দেহ এবং চোখে মুখে দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ছাপ—বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই মূর্তি আজও আমার স্মৃতিপটে আঁকা আছে।'

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বছরে তিনি গাইবান্ধার স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষা দেবার জন্য তাঁকে স্কুলের আর নয়জন ছাত্রের সঙ্গে কলিকাতায় আসতে হয়েছিল। এই সময়ে তাঁর ছাত্রজীবনের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ও দ্বিতীয় পর্বের শুরু। তাঁর প্রথমবার কলকাতা দর্শনের স্মৃতিপ্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন: 'আমার বয়স তখন চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয়ে পনের শুরু হয়েছে যখন আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্য কলকাতা যাই। স্টীমারে করে প্রথমে এলাম গোয়ালন্দ; তারপর সেখান থেকে রেলে করে কলকাতা। তখন কলিকাতায় বৈদ্যুতিক

আলো হয়নি, বিদ্যুৎ-ট্রামও চলত না। মোটর কচিৎ দৃষ্ট হ'ত, বাস নামক অতিকায় যানের আবির্ভাব তখন ঘটেনি, এমন কি সস্তা রিক্সাও ছিল না। ছিল শুধু ঠিকা গাড়ি, পালকি আর ঘোড়ায় টানা বিলাতি কোম্পানির ট্রাম গাড়ি। প্রশস্ত রাস্তা, পার্ক বা বায়ুসেবনের স্থান—এসব কিছুই ছিল না। আবর্জনাপূর্ণ বড়বাজারের নোংরা বস্তী চিরে তৈরি হয়েছে হ্যারিসন রোড নামক পাকা সড়কটি মাত্র বার কি চৌদ্দ বছর আগে। তখনও কলিকাতার সমাজে শোভাবাজারের দেব পরিবার, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর ও মল্লিক পরিবার বাগবাজারের বসু পরিবার ও পটলডাঙার বাবুরা—এইসব অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য ছিল।'

এই কলিকাতায় পনের বৎসর বয়সের কিশোর নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রথম এসেছিলেন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থী হিসাবে। ভবিষ্যতের মহানগরীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটেছিল ঠিক এই শতাব্দীর সূচনায়। তাঁর নিজের কর্মজীবনের ভবিষ্যৎ যে একদিন এই শহরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে এবং তখন থেকে বিশ বছর পরে পরিবর্তিত এক বিচিত্র পরিবেশে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে এই কিশোরই যে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে তাঁর স্বদেশবাসীকে নব-পর্যায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে সেদিন এটা বোধ হয় তিনি কেন, তাঁর পিতামাতা বা স্কুলের শিক্ষক অথবা সহপাঠী কারও কল্পনাতেই উদয় হয় নি। কলিকাতায় প্রথমবার এসে পক্ষাধিককাল অবস্থান করেছিলেন তিনি; পরীক্ষান্তে এখানকার দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দর্শন ক'রে এবং কালীঘাট মায়ের মন্দিরে পূজা দিয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র গাইবান্ধায় তাঁর পিতামাতার কাছে প্রত্যাবর্তন করেন।

ছাত্রজীবন

দ্বিতীয় পর্ব

পরীক্ষার ফল যথাসময়ে প্রকাশিত হ'লে জানা গেল যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। শুধু উত্তীর্ণ হওয়া নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বৃত্তিও লাভ করেছিলেন। পিতা খুশি হলেন, তাঁর স্কুলের শিক্ষকগণও, বিশেষ করে বনোয়ারিলাল বাবু, তাঁদের একটি ছাত্রের পরীক্ষায় এই রকম সাফল্যলাভে স্বাভাবিকভাবেই গর্ববোধ করলেন। পরীক্ষা হয়ে গেলে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার পৈতৃক

ভিটা মধ্যপাড়ায় আসেন ও সেখানে কয়েকসপ্তাহ অবস্থান করেন। এর আগে তিনি দুর্গাপূজার ছুটীতে তাঁর পিতামাতার সঙ্গে মাঝে মাঝে আসতেন। তাঁর ঠাকুরমায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে আর একবার এসেছিলেন।

'আমাদের বাড়িতে সেকালে বেশ ধূমধামের সঙ্গেই দুর্গাপূজা হ'ত। অতিথি-অভ্যাগত ও আত্মীয়-স্বজনে গ্রামের বাড়ি তখন ভরে যেত। সমস্ত গ্রামটাই যেন এই উপলক্ষে আনন্দমুখর হয়ে উঠ'ত। পূজার নতুন পরিচ্ছদ পরিধান করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উৎসবে মেতে উঠত। সাদাসিধা হলেও পূজার তিনদিন বাঁড়ুযো বাড়িতে প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করা হ'ত। স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়—এঁদের অনেকেই আমাদের প্রজা ছিলেন—অত্যন্ত সদ্ভাবের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসে পূজায় যোগদান করতেন। তখনকার দিনে বিক্রমপুরের এই গ্রামটিতে ষাটখানি পারিবারিক দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হ'ত এবং প্রত্যেক পূজা মণ্ডপ থেকে প্রসাদী ফল ও মিষ্টির বিনিময় চলত পারস্পরিক নিমন্ত্রণের মাধ্যমে। সামাজিক আচার-আচরণের মধ্যে এটি ছিল একটি বাধ্যতামূলক বিধান। ষষ্ঠীর দিন সকাল থেকেই পূজার উৎসব আরম্ভ হয়ে বিজয়াদশমীতে শেষ হ'ত। ঢাকের বাজনায়, পুরনারীদের কণ্ঠনিঃসৃত সুমিষ্ট উলুধ্বনিতে এবং মন-মাতানো সানাইয়ের আওয়াজে এই পাঁচদিন মধ্যপাড়া গ্রামটি যেন জমজমাট হয়ে থাকত। সে স্মৃতি ভুলবার নয়। তারপর বিসর্জনের পরে ধনী ও দরিদ্র, যুবক ও বৃদ্ধ, প্রভু ও ভৃত্য সকলেই পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হতেন, ছোটরা বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে পদধূলি নিতেন আর বড়রা তাঁদের অন্তরের আশীর্বাদ দিতেন উজার করে। সে দৃশ্যও ভুলবার নয়। সমস্ত গ্রামটিতে এই শিষ্টাচারের স্রোত বয়ে যেত এবং বিজয়ার সেই পুণ্যদিনটি যেন একটি নিটোল মানবিকতা বোধে রূপান্তরিত হয়ে যেত। লোকে বিগত দিনের শত্রুতা বিস্মৃত হ'ত এবং প্রীতি ও ভালবাসার নতুন বন্ধনে আবদ্ধ হ'ত।

'কোন কোন বড়লোকের বাড়িতে পূজা উপলক্ষে যাত্রা ও কবিগানের অনুষ্ঠান হ'ত। এরই আকর্ষণে আশপাশের গ্রামগুলি থেকে ছুটে আসত হাজার হাজার লোক। বড় নদী এবং অপেক্ষাকৃত ছোট নদী ও খালের ধারে যে সব গ্রাম অবস্থিত ছিল সেইখানে নৌকাযোগে শত শত দুর্গাপ্রতিমা বাদ্য সহকারে নিয়ে যাওয়া হ'ত ভাসান দেবার জন্য। আলোরই বা কি ঘটা ছিল! এই উপলক্ষে বাইচ-খেলা ও লাঠি খেলা এবং অন্যান্য শারীরিক ব্যায়াম প্রদর্শিত হ'ত। প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপূজা ছিল একটি জাতীয় উৎসব এবং এই উৎসবের

পরিধির মধ্যে অহিন্দুরাও সেকালে আকৃষ্ট হতেন। শুধু তাই নয়। এই পূজাকে উপলক্ষ্য করে গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের বন্ধনটা সুদৃঢ় হয়ে উঠত।'

এই সময়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র গ্রামের বাড়ি থেকে দুই দিনের জন্য ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর পনের বছরের জীবনে সেই প্রথম ঢাকাশহর তিনি চাক্ষুষ করেন। ঢাকা ছিল তাঁহার জেলার সদর, ঢাকা বিভাগের সদর এবং সমগ্র বাংলার মধ্যে দ্বিতীয় শহর। তাঁর প্রথমবার ঢাকা সন্দর্শনের স্মৃতিপ্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন: 'ঢাকায় বেড়াতে এসে প্রথমেই আমি এখানকার স্কুল কলেজগুলি দেখলাম। তারপর একে একে দেখলাম কোর্ট-কাছারী, ঢাকার নবাবের রঙমহল নামে প্রসিদ্ধ আবাসভবন, একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক কামান, রমনার প্রশস্ত খেলার মাঠ (যেখানে বর্তমানে গভর্নমেণ্ট হাউস, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভবন ও অন্যান্য অফিস স্থান পেয়েছে) এবং বুড়িগঙ্গার ওপরে বাকল্যাণ্ড বাঁধ। ঢাকাশহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এই নদীটি। কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি স্মরণ আছে পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ ও ব্যায়ামবীর পার্শ্বনাথের ব্যায়াম প্রদর্শনী আর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্কাস। শ্যামাকান্ত যখন সবশেষে বাঘের খাঁচার মধ্যে একলা গিয়ে একটি রয়াল বেঙ্গল বাঘের সঙ্গে নির্ভয়ে খেলা করতেন তখন তাই দেখে দর্শকদের মনে যুগপৎ ভয়, বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হ'ত। ইনি উত্তরকালে সংসার আশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সোঽহং স্বামী নামে ধর্মার্থীদের কাছে পূজিত হয়েছিলেন।

'আমার স্মৃতিপটে আজও বিদ্যমান রয়েছে ঢাকাশহরের একটি অপরিসর গলির মধ্যে অবস্থিত নোংরা, মাছি ও ছারপোকায় ভরা সেই হোটেলটি যেখানে আমি এক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলাম। হোটেলটির গায়েই ছিল একটি খোলা ড্রেন যা কোনদিনই পরিষ্কার করা হ'ত না। সেই ড্রেনের দুর্গন্ধ সারা হোটেলটায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। মুঘল আমলের পুরাতন শহরগুলির মতো ঢাকাশহরটিকেও আমার কাছে অস্বাস্থ্যকর মনে হয়েছিল; স্থানীয় পৌরসভার আদৌ কোন যোগ্যতা আছে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে তখন বিলক্ষণ সন্দেহ জেগেছিল। মনে হয়েছিল এখানকার কি হিন্দু, কি মুসলমান অধিবাসী কারও সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। ঢাকাতে কয়েকটি সুন্দর ঠাকুরবাড়ি দেখেছিলাম, বেশির ভাগই বৈষ্ণব মন্দির। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে বসাকরাই অপেক্ষাকৃত ধনী এবং এইসব মন্দির তাঁরাই নির্মাণ করিয়েছিলেন।

কয়েকটি মসজিদও দেখেছিলাম। কিন্তু সহরের সর্বত্রই খোলা ড্রেন আর বাজারগুলি যারপরনাই নোংরা। বড় এবং প্রশস্ত রাস্তাগুলি দিয়ে হাঁটবার সময় ড্রেনের দুর্গন্ধ অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হ'ত। ঢাকার মনোরম স্থান তিনটি। প্রথম, নদীর ধার। নদীর তীর ঘেঁষে সবুজ রঙের ভাসমান হাউস-বোটগুলি দেখতে খুবই চমৎকার লাগত। দ্বিতীয়, রমনার মাঠ আর তৃতীয় হ'ল ফরাসগঞ্জে পুলিশ লাইনের খেলার মাঠ। বাকী নরককুণ্ড বললেও অত্যুক্তি হবে না। এখানকার জীবনধারণ মোটেই ব্যয়বহুল ছিল না, বরং সস্তাই বলা চলে। অপর্যাপ্ত মাছ, দুধ, দুগ্ধ-জাত দ্রব্য আর সন্দেশের তো কথাই নেই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব দেখে খুব ভাল লেগেছিল। সঙ্গীত শিল্প-কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতে ঢাকার তখন খুব সুনাম ছিল।'

জুন, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।

আরম্ভ হ'ল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কলেজজীবন।

তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হলেন। এইবার গাইবান্ধা থেকে তিনি একলাই ঢাকা এসেছিলেন। একাকী ভ্রমণের সেই তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে যে খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। 'আমি ঢাকা রেলস্টেশনে নেমে, একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া করে সোজা ঢাকা কলেজের দিকে গেলাম। ভয় ও কৌতূহল মিশ্রিত ভাব নিয়ে ঢুকলাম কলেজ অফিসে। কাউকেই চিনতাম না। বয়স সবে পনের বছর, চালাক-চতুর মোটেই ছিলাম না।' এতকাল তিনি পিতামাতার সান্নিধ্যে বাস ক'রে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন। ছাত্রদের হস্টেলে বা মেসে থাকার কোন অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে কলেজ অফিসের হেড অ্যাসিসট্যাণ্ট (ইনিই আবার হস্টেল সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন) নবাগত এই ছাত্রটিকে প্রীতির চক্ষে দেখলেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন তাঁকে তাঁর বংশপরিচয় দিয়ে বললেন যে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি সরকারী বৃত্তি পেয়েছেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি আরও আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁকে সঙ্গে করেই হস্টেলে গেলেন।

এখনকার একটি আধুনিক কলেজ হোস্টেলের সঙ্গে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ছাত্রদের হস্টেলের তুলনা করলে ভুল হবে। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ঢাকায় মালীটোলা হিন্দুহস্টেলে থেকে ফার্স্ট আর্টস পড়েছিলেন। যে অপরিসর গলিটার ওপর এই হস্টেলটি ছিল তার নাম ছিল মালীটোলা—এটা বেরিয়েছে নবাবপুর রোড থেকে। গলিটি

মোটেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল না, হোস্টেলের বাড়িটাও ছিল খুব পুরানো। দোতলা বাড়ি—বাড়িওলার কাছ থেকে লীজ নেওয়া। কুয়োর জল ব্যবহার করতে হ'ত। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সময়ে সবশুদ্ধ ষাটজন ছাত্র এই হস্টেলের বাসিন্দা ছিলেন। হস্টেলের খাওয়াদাওয়া খুব ভাল ছিল না।

হোস্টেলে যেমন কলেজেও তেমনই সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি, আর সব ছাত্রেরা তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিল। সহপাঠীদের অনেকেই (যারা হস্টেলে থাকত) তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর মশারী টাঙিয়ে দিত ও তাঁকে নিয়ে বেড়াতে যেত। হস্টেলের প্রথম বাৎসরিক শ্রেণীর সব ছাত্রই নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে প্রীতির চক্ষে দেখত। কলেজে অল্পদিনের মধ্যেই যখন এই কথাটা জানাজানি হয়ে গেল যে ইংরেজীতে—কি লেখায়, কি বলায়—তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়, তখন থেকে তাঁর সহপাঠীদের অনেকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।

তখন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মিস্টার মণ্ডি। ইনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য বা যোগ্যতার বহর তেমন ছিল না, তবে তখনকার দিনে ইংরেজ হ'লেই তার স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন ঢাকা কলেজে ফার্স্ট আর্টসের ছাত্র তখন পাঠ্যতালিকায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও অঙ্ক—এই তিনটি বিষয় বাধ্যতামূলক ছিল। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পরেই তখন ঢাকা কলেজের স্থান ছিল। এখানকার ল্যাবোরেটরী ও গ্রন্থাগার বেশ সমৃদ্ধ ছিল। একজন রসায়নের অধ্যাপক বিজ্ঞানের বিষয় দুটি পড়াতেন ব'লে পদার্থবিদ্যার পঠনপাঠন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুব উন্নত মানের ছিল না। অঙ্কের অধ্যাপক অবশ্য একজন দিকপাল গাণিতিক ছিলেন—অধ্যাপক কালীপদ বসু—যাঁর বীজগণিত তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা আজও ভারতের সকল কলেজে পঠিত হয়ে থাকে। অঙ্কের আর একজন অধ্যাপক ছিলেন—রাজকুমার সেন। ইনি গণিতে যেমন পারঙ্গম ছিলেন তেমনই ছিলেন একজন খ্যাতিমান দাবা খেলোয়াড়।

'আমাদের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন স্বনামধন্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। ইনি পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের কিং জর্জ ফিফথ অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তখন তিনি হুগলী সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি আমাদের ইংরেজী ও ন্যায়শাস্ত্র পড়াতেন। তাঁর অধ্যাপনার গভীরতা বিস্ময়কর ছিল। অন্যান্য অধ্যাপকের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরে আমরা যাঁদের পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক হলওয়ার্ড সাহেব, (ইনি সুপণ্ডিত এবং ল্যাম্বের 'এসেজ অব এলিয়া' ও অন্যান্য ইংরেজী ক্লাসিক গ্রন্থের সম্পাদক ছিলেন)। বহু ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে (যিনি পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পদে উন্নীত হয়েছিলেন) এবং অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ। যতদূর স্মরণ হয়, এঁরা তিনজনেই অক্সফোর্ডের ডিগ্রীধারী ছিলেন।

'মনোমোহন ঘোষ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অধ্যাপক ভদ্র ছিলেন চমৎকার বলিয়ে-কইয়ে; কথ্য ও সাধু ইংরেজীতে তাঁর ছিল অসামান্য দখল। অন্য দিকে তিনি খুব সামাজিক ছিলেন, কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনিই নেতৃত্ব করতেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আমি যখন একবার বিশেষ প্রাইজ পরীক্ষায় (এর নাম ছিল প্রিটোরিয়া প্রাইজ; তখন সবেমাত্র ইংরেজরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রদের কাছ থেকে প্রিটোরিয়া অধিকার করেছে; তারই স্মারক ছিল এই বিশেষ পরীক্ষাটি।) ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম তখন আমাকে তিনি খুব উৎসাহিত করেছিলেন। আমার বেশ স্মরণ আছে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ইংরেজীতে আমার ভাল দখল আছে।

'আমাদের পাঠ্যতালিকায় ছিল মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট (বুক ১ ও ২)। ব্ল্যাকের গোল্ডস্মিথের জীবনী, টেনিসনের আইলমারস ফিল্ড। এখনকার মতো ছাত্র-সহায় কোন বই বা প্রশ্নোত্তরের সহজ কোন বই তখন বিরল ছিল। আমাদের নির্ভর করতে হ'ত অধ্যাপকদের উপর। ফার্স্ট আর্টসের পরীক্ষা খুবই কঠিন ছিল। আমরা যে বছর (১৯০২) ঐ পরীক্ষা দিয়েছিলাম সে বছরে ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ১৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিল; বেশির ভাগ ছাত্র ইংরেজীতেই অকৃতকার্য হয়েছিল। কিছু বিজ্ঞান ও গণিতে আবার কেউ-বা সংস্কৃত, ন্যায়শাস্ত্র ও ইতিহাসে। হরিনাথ দে আমাদের কয়েক সপ্তাহ প্যারাডাইস লস্ট পড়িয়েছিলেন এবং তারপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। হলওয়ার্ড সাহেবও পড়িয়েছিলেন; মিলটনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি অতি সুন্দর পড়াতে পারতেন; ছাত্রদের কাছে মিলটনের রচনার ধ্বনিমাধুর্য তাঁর উচ্চারণে যেন মূর্ত হয়ে উঠত। অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ কবি ছিলেন। কবিরা সাধারণত একটু লাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকেন। তিনিও ঐ প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর অধ্যাপনা সাধারণ ছাত্রের বোধগম্য হ'ত না, কারণ তিনি তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার উজার ক'রে দিতেন যা সকলের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন ছিল। ওয়ালটার প্যাটার, শেলি, ব্রাউনিং ও

ল্যাণ্ডর সম্বন্ধে তাঁর লেকচার ক্লাসে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত—এমনই ছিল তাঁর অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য।'

ঢাকায় তাঁর ছাত্রজীবনে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ বলতে বিশেষ কিছু ছিল না এমন কি, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বলেছেন, কলিকাতায় বি. এ. পড়তে আসার আগে পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে খবরের কাগজই পড়তেন না। কলেজের বাইরে ঢাকায় ছাত্রদের আকর্ষণের বিষয় ছিল পটুয়াটোলায় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ। এটা তাঁদের কলেজের কাছেই ছিল। আর একটি আকর্ষণের বিষয় ছিল ব্যাপটিস্ট মিশন; এখানে খ্রীস্টান ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্যগণ বাইবেল শেখাতেন। তাঁরা সমাজসেবার কাজেও অগ্রণী ছিলেন। তবে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণটাই ছিল তাঁদের কাছে অপেক্ষাকৃত প্রবল; এই আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলেন জগন্নাথ কলেজের (এটাই তখন ঢাকার একমাত্র বেসরকারী কলেজ ছিল) অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ইংরেজীতে তিনি যখন সমাজে বক্তৃতা করতেন ঢাকা কলেজের ফার্স্ট আর্টসের কিছু ছাত্র তখন তা বেশ মন দিয়ে শুনত। ঢাকার তরুণ সমাজের কাছে তিনি খুব প্রিয় ছিলেন।

অধ্যক্ষ মৈত্রপ্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন: 'নানা দিক দিয়ে একটি আশ্চর্য ব্যক্তি ছিলেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি একজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর ব্যক্তিত্ব সকলকেই তাঁর প্রতি আকর্ষণ করত। এমার্সনীয় ভাবধারায় নিষ্ণাত ছিলেন বলেই তিনি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ মানুষ ছিলেন। উত্তরকালে তাঁর নীতিনৈতিকতা একটা কিম্বদন্তীতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর তুল্য বার্ক ও কার্লাইল খুব কম অধ্যাপকই পড়াতে পারতেন। অনেকের কাছে তিনি একজন 'পিউরিটান' বলে গণ্য হতেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের যে দিকটা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তা হ'ল তাঁর আন্তরিকতা আর স্বীয় মতে বিশ্বাস। তিনি একজন যথার্থ জ্ঞানতাপস ছিলেন; শিক্ষাবিদ্ হিসাবে তাঁর সময়ে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জীবনে সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন নি; দারিদ্র্যকে বরণ ক'রে তিনি আজীবন নিজের বিশ্বাসে স্থির ছিলেন। তিনি একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদী ছিলেন। সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে এবং এই শিক্ষানিকেতনের একজন 'ফেলো' হিসাবে, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র কয়েকপুরুষ ধরে বাংলার ছাত্রসমাজের একজন বরেণ্য আচার্য ছিলেন।'

নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র তখন যে ঘটনাটি তাঁর ছাত্রজীবনে

গভীরভাবে দাগ কেটেছিল সেটি হল ঢাকায় স্বামী বিবেকানন্দের আগমন। ১৯০১ সালের মার্চ কি এপ্রিল মাসে স্বামীজী এখানে এসেছিলেন। সেই সময়ে তিনি স্থানীয় জগন্নাথ স্কুল হলে ইংরেজীতে বক্তৃতা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন: 'স্কুলের হলটিতে অগণিত শ্রোতার সমাগম হয়েছিল—প্রায় একহাজার লোক সেদিন তাঁর বক্তৃতা শুনতে সমবেত হয়েছিল। তখন তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন ক'রে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ভারত-সংস্কৃতি, ভারতের দর্শন চিন্তা ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধ'রে তিনি ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। শিকাগো ধর্মসভায় ও পরে য়ুরোপ ও আমেরিকায় তাঁর তেজস্বিনী বক্তৃতা পাশ্চাত্ত্যের সহস্র সহস্র ধর্মপ্রাণ নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে স্বামীজীর যে অগ্নিময়ী উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল তার ফলে আমার জীবনধারা একটা উন্নত খাতে তখন থেকেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছিল।'

জুন, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র ঢাকা থেকে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়তে এলেন। এখানে এসে প্রথম যাঁকে তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ। নাম মিস্টার এডওয়ার্ডস। তিনি খুব ভাল শেক্সপিয়ার পড়াতেন। এঁর পরেই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হলেন ডঃ প্রসন্নকুমার রায়। ইনি ছাত্রমহলে সাধারণত পি. কে. রায় হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর ছিল বিলাতি ডিগ্রী। দর্শনে সুপণ্ডিত। তাঁর লেখা Deductive Logic বা অবরোহ ন্যায়শাস্ত্র বইখানি তখন খুব বিখ্যাত পাঠ্য গ্রন্থ ছিল। বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁদেরও খ্যাতি তখন সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। সাহিত্য-বিভাগে ছিলেন অধ্যাপক এইচ. এম. পার্সিভাল—ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। ছাত্রসমাজে তাঁর তুল্য জনপ্রিয় অধ্যাপক সেদিন দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। ইংরেজী সাহিত্যের আর একজন অধ্যাপক ছিলেন জে. এন. দাসগুপ্ত; তিনিও অক্সফোর্ডের উপাধিধারী অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রসমাজে অধ্যাপক দাসগুপ্তও খুব প্রিয় ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আর যে সব অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের মধ্যে শশিভূষণ দত্ত, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, সারদাপ্রসন্ন দাস ও কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যে দুইবৎসর নৃপেন্দ্রচন্দ্র শিক্ষালাভ করেছিলেন তার ফলে

তাঁর জীবনের বুনিয়াদ বহুল পরিমাণে সুদৃঢ় হয়েছিল। উত্তরকালে তাঁর ছাত্রদের কাছে এই কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বিশেষ গর্ববোধ করতেন। বলতেন, তাঁদের আমলে ছাত্রগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করত এবং সেই পরিশ্রমে আনন্দবোধ করত। তখনকার দিনে কোন ছাত্রই 'মেড ইজি' ('Made Easy') পড়ে পাশ করত না ; কিম্বা গৃহ-শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'ত না। তিনি নিজে কোন দিন গৃহ-শিক্ষকের কাছে পড়েন নি। নৃপেন্দ্রচন্দ্র আরও বলতেন, তাঁদের সময়ে সকল ছাত্রই কলেজকে দেব-মন্দিরের ন্যায় পবিত্র স্থান ব'লে মনে করত। তখন ছাত্রেরা অধ্যাপকগণের কাছ থেকে আরেকটি জিনিস শিক্ষা করত—শিষ্টাচার। তাঁর অধ্যাপকগণের চমৎকার অধ্যাপনার কথা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মনে চিরদিন জাগরূক ছিল।

বলেছি পার্সিভাল সাহেব ছিলেন ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক। এঁর দুটি উপদেশ নৃপেন্দ্রচন্দ্র কোনদিনই বিস্মৃত হন নি, যথা, প্রথম—'Your manners must not be at fault' ; দ্বিতীয়—'Mind you, my young boys, in attempting to grasp the shadow, you may lose the substance'. বলা বাহুল্য, উত্তরকালে কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হয়ে, কি শিক্ষক হিসাবে, কি দেশসেবক হিসাবে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর প্রতিটি কর্ম ও চিন্তায় এই অমূল্য উপদেশ দুটি প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করতেন। তাই বলছিলাম, প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষা তাঁর জীবনের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। এর আরও একটা কারণ ছিল। এই শিক্ষায়তনে ছাত্ররূপে যে প্রবিষ্ট হ'ত তার মনে স্বভাবতই এই ভাবটি জাগত যে সে প্রেসিডেন্সির ছাত্র। এখানকার ছাত্র হওয়া অনেকের কাছে সৌভাগ্যের বিষয় বলে বিবেচিত হ'ত। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এই কলেজ সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কথাটি খুব প্রচলিত ছিল: 'Who is anybody in the public life, he must have been somebody of the Presidency College.'

কথাটির তাৎপর্য আজকের দিনে—শিক্ষাক্ষেত্রে শোচনীয় অব্যবস্থার দরুন বর্তমানের বহুনিন্দিত ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে—বিশেষভাবেই অনুধাবনের বিষয়। বাংলার রেনেসাঁসের প্রথম পর্বের নায়কবৃন্দ সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। তারপর সেই হিন্দু কলেজ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় তখন থেকে বাংলার নবজাগরণকে যাঁরা সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন এখানকার ছাত্র। বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে যাঁরাই

এক সময়ে গৌরবের আসন অধিকার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই এই কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বাংলার একাধিক কৃতী সন্তানকে আমরা এখান থেকেই পেয়েছি এবং এই কলেজে শিক্ষালাভ ক'রে উত্তরকালে তাঁদের অনেকেই সমাজের বহুক্ষেত্রে—বিশেষ ক'রে শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে—গৌরবজনক স্থান লাভ করেছিলেন। শিক্ষার আদর্শটাই তখন ছিল অন্য রকম আর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটাও ছিল ছাত্রদের চরিত্রগঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক। বাংলা তথা ভারতের প্রথম স্নাতক ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন এই কলেজের ছাত্র ছিলেন, তেমনই ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বাংলায় গান্ধী-যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র ও দেশসেবক নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। শিক্ষকতার বৃত্তি ত্যাগ ক'রে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন রাজনীতিতে যোগদান করেন তখন তিনি কিভাবে এঁদের সকলের সঙ্গেই একযোগে কাজ করেছিলেন সে কাহিনী আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করব। এখানে উল্লেখ্য যে যতীন্দ্রমোহন ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র একই বছরে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; যতীন্দ্রমোহন আগে, নৃপেন্দ্রচন্দ্র পরে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁরা অবশ্য সহপাঠী ছিলেন না। যতীন্দ্রমোহন যখন ছাত্র হিসাবে এই কলেজে প্রবিষ্ট হন তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বি. এ. পাশ করেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি গৌরমময় যুগে (ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের কথায় 'স্বর্ণযুগ') নৃপেন্দ্রচন্দ্র এখানকার ছাত্র ছিলেন। কলেজের বাইরে এখানে আর একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। সেটি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট। এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি সেদিন কলিকাতার কলেজের ছাত্রদের জীবনে এক কল্যাণপ্রদ প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'বিদ্যায়তনের ভিতরের সহিত বাহিরের মিলন এইখানেই, শাস্ত্রীয় বিদ্যার সহিত কলাবিদ্যার মিলন, অধ্যাপকের সহিত ছাত্রদের, নূতন ছাত্রের সহিত পুরাতন ছাত্রের মিলনের এই ক্ষেত্র।' ইনষ্টিটিউটের প্রসঙ্গে উত্তকালে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বলতেন: 'আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তাম তখন কলিকাতার কলেজ-ছাত্রদের জীবনে ইনষ্টিটিউট একটা মস্ত বড় factor ছিল। এখানে পরস্পর মেলামেশার ফলে ছাত্রদের চিত্ত সরস ও তাদের অর্জিত বিদ্যা প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠন করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য।'

উনিশ শতকের শেষ দশকে কলিকাতার সমাজজীবনের নেতৃত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত

ছিল তাঁদের মধ্যে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ অগ্রণী হয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, বলা বাহুল্য, বিংশশতকের প্রথম দশকের মধ্যেই তার সুফল পরিলক্ষিত হয়েছিল। অন্তত প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম দশকের ছাত্রদের অনেকের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ব্যবহারে শিষ্টতা, আচরণে মার্জিত রুচির পরিচয়, বুদ্ধিতে বাস্তববোধ, চরিত্রে দৃঢ়তা আর বিশুদ্ধ জীবন ও সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নিবিড় ছিল, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁর চরিত্রে ও চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে এইসব গুণ কি সুন্দরভাবেই না প্রতিফলিত হয়েছিল। কলেজে প্রবিষ্ট হওয়ার অল্পকাল পরেই তিনি, তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহপাঠী সহ ইনস্টিটিউটের জুনিয়র মেম্বর হয়েছিলেন। ইনস্টিটিউটের খেলাধুলা বিভাগের সঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল না। তাঁর ছাত্রজীবনে—কি স্কুলে, কি কলেজে—তিনি কখনও কোন খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট হন নি। তবে সাংস্কৃতিক বিভাগটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণকে এখানে মাসে একবার ক'রে আহ্বান করা হ'ত ও তাঁরা বক্তৃতা করতেন। এইরকম বক্তৃতা তখন বছরে বারোটা হ'ত। ইনস্টিটিউটের জুনিয়র সভ্যতালিকাভুক্ত হয়ে অবধি নৃপেন্দ্রচন্দ্র এইসব বক্তৃতার একটিও বাদ দিতেন না। তবে, শুনেছি, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের বক্তৃতাই আকর্ষণীয় ছিল। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন এবং স্বীয় চরিত্রগুণে তিনি ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন।

কলিকাতায় পড়তে এসে নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রথম কিছুকাল হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে পটলডাঙা স্ট্রীটের একটি মেসে অবস্থান করেছিলেন। এই মেসটি ছিল একটি দোতলা বাড়ি এবং এর বাসিন্দা সকলেই ছিল পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। বাসিন্দার সংখ্যা ছিল চব্বিশ; এঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিলেন অফিসের চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী; কিছু সংখ্যক ছিলেন যাঁরা এম. এ. পাশ করার পর আইন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকরির সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। কতকগুলি বাসিন্দা ছিলেন যাঁরা বছরের পর বছর বি. এ. পরীক্ষা দিতেন ও অকৃতকার্য হতেন আর কিছু স্কুলের ছাত্রও ছিলেন।

বি. এ. ক্লাসে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পাঠ্য বিষয় ছিল ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন (পাস ও অনার্স) এবং সংস্কৃত। তখন কোন ছাত্র ইচ্ছা করলে তিনটি বিষয় পর্যন্ত অনার্স নিয়ে পড়তে পারতেন। 'আমি কতকটা অব্যবস্থিত চিত্তে দুটি বিষয়ে অনার্স

নিয়েছিলাম—ইংরেজী সাহিত্য (এই বিষয়টিতে আমি বিশেষভাবেই দক্ষ ছিলাম) আর দর্শন। কিন্তু পরে আমি বুঝেছিলাম যে এই বিষয়টিতে আমি নিতান্তই অনুপযুক্ত ছিলাম। ঢাকার তুলনায় কলিকাতা ছিল প্রকাণ্ড শহর আর এখানে আমার মতো গ্রাম্য ছেলের মনকে বিক্ষিপ্ত করার জন্য ছিল নানা রকমের ব্যবস্থা। সকলের উপর ছিল অভিভাবকের তত্ত্বাবধানের অভাব। এর ফলে কলেজে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম ছয়মাস পড়াশুনায় আমি খুব বেশি অগ্রসর হতে পারিনি। কলেজে যেতাম, লেকচার শুনতাম আর বাকী সময়টা মেসে আলস্যে অথবা দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে কিম্বা থিয়েটার দেখে অতিবাহিত করতাম।'

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কিছু নতুন বন্ধু পেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন ঢাকার কিছু সংখ্যক পুরাতন সহপাঠীদের যাঁরা কলিকাতায় এসে এই কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি এই কয়জনের নামোল্লেখ করেছেন: তারিণী বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, সুবোধ সরকার, অক্ষয় দত্তগুপ্ত, সুরেশ দত্ত-গুপ্ত, রাধাগোবিন্দ নাথ ও সীতাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তরকালে এঁরা সকলেই তাঁদের কর্মজীবনের স্ব স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধু হিসাবে যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রবোধ দে, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, তারিণীকান্ত নাগ, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নবগৌরাঙ্গ বসাক, সুশীল মুখোপাধ্যায়, কিরণ কুমার সেনগুপ্ত, শৈলেন্দ্র কুমার সেন ও অশোক কুমার রায়। উত্তরকালে এঁরা সকলেই তাঁদের চরিত্র ও প্রতিভা বলে কর্মজীবনে নিজনাম মুদ্রাঙ্কিত করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী ও বন্ধুদের মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র দুইজনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যথা,—রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। 'কলেজের সেরা আর্টস ছাত্র ছিলেন রবীন্দ্রনারায়ণ; তাঁর তুল্য ইংরেজীতে সুপণ্ডিত আমি কমই দেখেছি। শিক্ষাবিভাগে চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ইনি রিপন কলেজে যোগদান করেন এবং কর্মদক্ষতায় তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের লেকচারারও ছিলেন। অপূর্ব চরিত্রে দেদীপ্যমান মানুষ ছিলেন তিনি। প্রকৃত ভদ্রলোক বলতে যা বুঝায় তিনি ছিলেন ঠিক সেই রকম মানুষ। প্রথমজীবনে তিনি মাত্র পঁচাত্তর টাকা বেতনে পাঁচ বৎসর কাল বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন।'

সহপাঠী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে লিখেছেন: 'এই বিখ্যাত বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক ১৯০৭ সাল থেকেই দেশের মুক্তিসংগ্রামে নিজেকে আজীবন নিয়োজিত রেখেছেন। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে একটি সরকারী কলেজের অধ্যাপনা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জ্যোতিষচন্দ্রের হাতে বাংলার শত শত তরুণ দেশপ্রেমিক তৈরি হয়েছে এবং তাদের তিনি যেভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরি করেছিলেন তার কোন তুলনা হয় না। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ও তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র সদ্ভাব ছিল না। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে, পূজার ছুটীর পর আমি যখন পটলডাঙার মেস পরিত্যাগ ক'রে অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে উঠে আসি, তখন সেখানে দেড় বৎসর আমি ও জ্যোতিষচন্দ্র একটি ঘরের বাসিন্দা ছিলাম।'

আজন্ম দুঃখব্রতী, সর্বত্যাগী এই দেশপ্রেমিক ও শিক্ষক উত্তরকালে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে রাজনীতি ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জ্যোতিষচন্দ্র ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র দুজনেই বাংলার ছাত্রসমাজে মাস্টার মশাই নামে পরিচিত ছিলেন। জ্যোতিষচন্দ্রের কথা পরে আরও বলব। বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে এই দুইজনই তাঁদের নিজনামের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। আমরা দেখতে পেলাম যে, নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন কলিকাতায় ছাত্র হয়ে এসেছিলেন তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে কি অধ্যাপকের, কি ছাত্রের যেন চাঁদের হাট বসেছিল। শিক্ষার একটা শুচিশুদ্ধ মূর্তি তখন এই শিক্ষায়তনে যে রকম উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছিল তার যেন কোন তুলনাই হয় না। যোগ্য শিক্ষক আব যোগ্য ছাত্রের সমাবেশ ঘটলে একটি শিক্ষায়তন দেশকে, জাতিকে উন্নতির পথে কতদূর নিয়ে যেতে পারে এই শতকের প্রথম দশকের প্রেসিডেন্সি কলেজের গৌরবময় ইতিহাস যেন তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে।

আগেই বলেছি, নৃপেন্দ্রচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন এই দুইটি বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে তিনি দর্শনের অনার্স ত্যাগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগে তাঁর কলেজে টেস্ট পরীক্ষার ফল আশাপ্রদই হয়েছিল। কলেজের টেস্ট পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্স পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন; পরীক্ষক ছিলেন পার্সিভাল স্বয়ং। ন্যায়শাস্ত্রেও প্রথমস্থান ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ হয়নি—এমনকি বি. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর গৌরবও লাভ করতে পারেননি।

এর অবশ্য একটা প্রধান কারণ ছিল তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মাবকাশের পর যখন তিনি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তে এলেন তখন তিনি মস্তিষ্কের অবসাদ জনিত অসুখে ভুগছিলেন। সে সঙ্গে আর একটি উপসর্গ ছিল —শিরঃপীড়া। এই দুইটি অসুখে ভুগবার ফলে তাঁর স্মৃতিশক্তি কিছু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষা দিলেন। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর ছাত্রজীবনের পরবর্তী অধ্যায় ১৯০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজেই তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হলেন ও এই সময়ে তিনি ইডেন হস্টেলের বাসিন্দা ছিলেন। তখনকার দিনে কলিকাতায় এটাই ছিল ছাত্রদের শ্রেষ্ঠ আবাস। তাঁর সময়ে ইডেন হস্টেলে ২৫০ জন ছাত্রবাসিন্দা ছিল। কিছু সংখ্যক বিহারী ছাত্রও ছিল এবং তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ইডেন হস্টেলে থাকবার সময়ে কয়েকজন সহপাঠী মিলে একটি পাঠ-চক্র (study circle) স্থাপন করেছিলেন। এই পাঠ-চক্রের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, অক্ষয় দত্তগুপ্ত, সুরেশ দত্তগুপ্ত, বঙ্গেন্দু ভূষণ মুখোপাধ্যায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও আরও দুই-একজন। তাঁর বাংলা সাহিত্যপ্রীতির এই ছিল সূচনা। আর এই সাহিত্যপ্রীতির মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-কবিতাকে কেন্দ্র ক'রেই সেদিন ইডেন হস্টেলে এই পাঠ-চক্রটি গড়ে উঠেছিল এবং নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন সকলের চেয়ে উৎসাহী সভ্য। তখন কবির 'নৈবেদ্য', 'গীতালি', 'গীতাঞ্জলি', 'মানসী', 'সোনার তরী' ও অন্যান্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সভ্যদের মধ্যে এই কাব্যগুলি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা হ'ত এবং ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ঠিক ঐরকম ভাব-ব্যঞ্জক কবিতা খুঁজে বার করা হ'ত। এইভাবে ছাত্রজীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রকাব্যে অবগাহন করার ফলে পাঠ-চক্রের সভ্যদের, বিশেষ করে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মনে সাহিত্যের দিগন্ত এমন প্রসারলাভ করেছিল যে তাঁর মানস-মণ্ডল রবীন্দ্র-কবিতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তখন থেকেই তাঁর চিন্তায় ও চেতনায় রবীন্দ্রনাথের আসন স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। তাই দেখা যায় যে উত্তরকালে আচার্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কলেজে ছাত্রদের যখন ইংরাজী কবিতা পড়াতেন, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে সমভাবসম্পন্ন ছত্র বা স্তবক উদ্ধৃত করে তাঁর ছাত্রদের মনকে সরস ও সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে প্রয়াস পেতেন। তাঁর পূর্বে আর কোন অধ্যাপক ঠিক এইভাবে ছাত্রদের পড়াতেন না।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে একুশ বছর বয়সে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ইংরেজীতে প্রথম বিভাগে এম. এ. পাশ করেন। তাঁর সহপাঠী রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এইবার তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরু। কিন্তু সেই অধ্যায়ের আলোচনা করার পূর্বে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা কিছু বলা দরকার। কারণ এই ত্যাগব্রতী দেশসেবকের জীবনে ১৯০৫-এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

১৯০৫-এর বাংলা ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় নৃপেন্দ্রচন্দ্র নবযুবক। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময়কার প্রবল ভাব-বিক্ষোভের বন্যা তাঁর মনের ওপর কি রকম আঘাত করেছিল ও কি রকম ছাপ রেখে গিয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি তাঁর আত্মচরিতে কিছুটা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার ইতিহাসটা আলোচনা করেন নি। কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হওয়ার সার্ধ এক দশক পরে তিনি যখন সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিলেন সেটা অনেকের কাছে আকস্মিক মনে হ'লেও, প্রকৃতপক্ষে তা আকস্মিক ছিল না। বলা যেতে পারে সেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেই সকলের অগোচরে এর প্রস্তুতিটা হয়ে থাকবে।

স্বদেশী আন্দোলন যে জাতীয় জাগরণ, যার আরম্ভ ১৯০৫-এর পূর্বেই আমাদের দেশের মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশের মধ্যে দেখা যায়, সেই জাগরণের জন্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র মনেপ্রাণে উত্তমরূপেই প্রস্তুত ছিলেন। যে জাতীয়তা রামমোহনের অন্তরে উন্মেষ লাভ ক'রে ক্রমশ বহু মহাপুরুষের ভাব ও চিন্তার দ্বারা পুষ্ট হয়ে শেষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে নিজ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সে জাতীয়তার যে মানসিক আবহাওয়া ও শিক্ষার বুনিয়াদ তার সঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পূর্ণ পরিচয় ছিল। কারণ এই পরিচয় যদি না থাকত তাহলে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করতেন কিনা সন্দেহ। কাজেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার পটভূমি হিসাবে এখানে ১৯০৫-এর বাংলার কথা কিছুটা আলোচনা করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, তার বেদী রচনা করেছিল উনিশ শো পাঁচের সেই বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন। এটা

ইতিহাস-সম্মত সত্য। জীবন ও ইতিহাস একসূত্রে বিধৃত। তাই কারও জীবনের তাৎপর্য বুঝতে হ'লে সেই জীবনের চালচিত্রটা আমাদের দৃষ্টির সামনে রাখতেই হয়। উনিশ শো পাঁচের আগমনীটা শোনা গিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে উনিশ শো দুই খ্রীষ্টাব্দেই। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। বাঙালির জাতীয় জীবনে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দটি একটি সাধারণ বৎসর ছিল না—এটাই ছিল আলো ও উত্তাপপূর্ণ একটি অবিস্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়। অনেক শিখা পুড়ে পুড়ে প্রদীপ যেমন নিষ্কম্প ও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে তেমনই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালির জীবনের প্রদীপটাও শিখার পর শিখায় দগ্ধ হয়ে জ্বলে উঠেছিল এবং তারই আভায় রঙিয়ে গিয়েছিল স্বদেশী যুগের বাংলার আকাশ। নানা ঘটনার স্রোতে, একের পর এক তরঙ্গ তুলে বাঙালির মনের তটে সেই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দটি যে আঘাত হেনেছিল, তা-ই অল্প কিছু কাল পরে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে তার ঐতিহাসিক পরিণতি লাভ করেছিল। সেই বিচিত্র স্রোতোধারা এক লক্ষ্যে ধাবিত হতে হতে যে আবর্তের সৃষ্টি করেছিল তারই দুকূলপ্লাবী রূপ আমরা দেখেছিলাম স্বদেশী যুগের বাংলায়। উনিশ শো দুই নিঃসন্দেহে রচনা করেছিল উনিশ শো পাঁচের আগমনী সঙ্গীত।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। কলিকাতা তখন ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের রাজধানী; লর্ড কার্জন বড়লাট। যেমন ছিল তাঁর আমীরি মেজাজ, তেমনই উদ্ধত প্রকৃতির রাজ-পুরুষ ছিলেন তিনি। কার্জনী শাসন-নীতি অবশ্য ভারতবাসীর পক্ষে, বিশেষ ক'রে বাঙালির পক্ষে, শাপে বর হয়েছিল। এক মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে জর্জ ন্যাথানিয়াল কার্জন তাঁর কার্যভার গ্রহণ ক'রে এদেশে এসেছিলেন। ভারতের সর্বময় কর্তার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই লর্ড কার্জন লণ্ডনের এক সম্বর্ধনা সভায় বলেছিলেন: 'আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি, এর অধিবাসী, এর ইতিহাস, এর বিচিত্র সভ্যতা ও জীবনযাপনের পদ্ধতি সম্পর্কে আমার অনুরাগ আছে।'[১] কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, কার্জনের এই অনুরাগই শেষে বিরাগে পরিণত হয়েছিল।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

লর্ড কার্জনের হাত থেকে নেমে এল বঙ্গচ্ছেদের খড়্গাঘাত। বাংলার মাথায় যেন অকস্মাৎ বজ্র পড়ল। তিনি বাঙালিকে—যে বাঙালি তখন রাজনৈতিক

১। লাইফ অব লর্ড কার্জন: রোনাল্ডশে।

চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে—দুর্বল করবার জন্য বাংলাকে খণ্ডিত ক'রে পূর্ববঙ্গ আসামের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত করবার প্রস্তাব করলেন; পশ্চিমবঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। বাংলার নেতৃবৃন্দ আলোচনা করে ঠিক করলেন বিলাতের পার্লামেন্ট অনুমোদন করার আগেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে হবে। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি, দু' হাজারটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভাগুলিতে মুসলমানরাও যোগদান করেছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, একমাত্র অরবিন্দ ঘোষ (ইনি তখন বরোদা রাজকলেজে অধ্যাপনার কর্মে নিযুক্ত ছিলেন) এই কার্জনী প্রস্তাবের মধ্যে ইতিহাস-বিধাতার আশীর্বাদ দেখতে পেয়েছিলেন। নেভিনসন (যিনি সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর একজন নিপুণ ভাষ্যকার ছিলেন) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'ভারতের ভাগ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবটিকে অরবিন্দ ঘোষ সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ব'লেই গণ্য করেছিলেন। কারণ তিনি মনে করেন এর দ্বারা বাঙালির উপকার হয়েছে। বহু বছরের নৈষ্কর্ম্য ও অবসাদ থেকে জাতিকে জাগিয়ে তুলতে অথবা জাতীয়তাবোধকে এমন গভীর-ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে আর কোন উপায়ই সক্ষম হ'ত না।'[১] কথিত আছে তাঁর এই সুস্পষ্ট অভিমতটি অরবিন্দ ঐ বিদেশী লেখকের নিকট স্বয়ং ব্যক্ত করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে কোন এক সময়ে। নেভিনসনের মতে অরবিন্দই ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ।

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চারিদিকে বিক্ষোভ দেখা দিল। বিক্ষোভ থেকে প্রতিবাদ। বাংলার নেতৃবৃন্দ হাজার হাজার গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকপত্র পাঠালেন বিলাতে ভারত-সচিবের কাছে। (আজকাল যাকে বলা হয় **Signature campaign** বা স্বাক্ষরসংগ্রহ অভিযান, দেখা যাচ্ছে, তার সূচনা প্রথম স্বদেশী যুগের বাংলায় হয়েছিল।) এই স্মারকপত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও স্বাক্ষর করেছিলেন। এর মুসাবিদা রচনা করেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, যাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল সেই স্বদেশী আন্দোলন। আট মাস পরে বিলাত থেকে সংবাদ এল—পার্লামেন্ট কার্জনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। এই সময়ে কার্জন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন —'The partition of Bengal is a settled fact.' এরই প্রত্যুত্তর শোনা গিয়েছিল টাউন হলের এক মহতী জনসভায় সুরেন্দ্রনাথের বজ্রকণ্ঠে: 'I will

১। দি নিউ স্পিরিট ইন ইণ্ডিয়া: নেভিনসন।

unsettle the settled fact.' প্রকৃতপক্ষে তাঁর কণ্ঠকে আশ্রয় করে এটা ছিল সমগ্র দেশবাসীর চ্যালেঞ্জ।

এই সভা হয়েছিল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তারিখে কলিকাতার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ টাউন হলে। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখন স্নাতকোত্তর ছাত্র এবং ছাত্র-নেতা দুই-ই। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন : 'We as post-graduate student leaders joined the agitation against the Partition of Bengal concerned and carried out by Lord Curzon and we came soon after in 1905. And I, for one, had my first lessons in political agitation then. The year 1905 is a memorable year in the life-story of myself and my contemporaries. Many of us were caught up in the eddies of the nation-wide revolution.'[১] তাঁর এই সুস্পষ্ট উক্তির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, নৃপেন্দ্রচন্দ্রের রাজনৈতিক সত্তার উন্মেষ তাঁর ছাত্রজীবনেই ঘটেছিল আর তার সার্থক পরিণতিটা দেখা গিয়েছিল পনের বছর পরে তাঁর শিক্ষক জীবনে।

টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল। এই স্মরণীয় সভার সভাপতি ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। এই সভাতেই সর্বাত্মক জাগরণকে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। এই সভায় বাঙালি এই শপথ গ্রহণ করেছিল : 'যদি বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়, তাহলে বাঙালি বিলাতি বস্ত্র, বিলাতি দ্রব্য বর্জন করবে।' লক্ষ কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল এই শপথ। এই স্মরণীয় শপথের বাণীরূপ রচনা করেছিলেন সেদিনের চারণ-কবি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে :

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।

১। এ্যাট দি ক্রশরোড্স : ব্যানার্জি।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

সিমলা শৈল শিখর থেকে সরকার ঘোষণা করলেন বঙ্গ-বিভাগ। এক বাংলা—পূর্ব বাংলা আর পশ্চিমবাংলা হয়ে ভারতের মানচিত্রে ফুটে উঠল; এক বাঙালি কার্জনের কলমের এক খোঁচায় দুইভাগে আলাদা হয়ে গেল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব এখন আইনত বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করল। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান কিন্তু এই স্বৈরাচারী বিধান মেনে নিল না। এরই বিরুদ্ধে শুরু হ'ল তীব্র এবং ব্যাপক আন্দোলন।

২রা সেপ্টেম্বরকে বাঙালি গ্রহণ করল একটি অশৌচের দিন হিসাবে—শোক প্রকাশের দিন হিসাবে। প্রভাতসূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মহানগরীর রাজপথ দিয়ে দলে দলে লোক চলেছে নগ্নপদে গঙ্গার দিকে। সে দৃশ্য ভুলবার নয়। সেই জনতার পুরোভাগে দেখা গেল নবজাগরণের পুরোহিত রবীন্দ্রনাথকে। তিনিও নগ্নপদে চলেছেন সেই জনতার সঙ্গে। নেতারা সবাই আছেন। সকলে একসঙ্গে গঙ্গায় স্নান করলেন। ভারতভাগ্যবাহিনী গঙ্গার পবিত্র বারি অঞ্জলিপুটে ধারণ করে সবাই বলতে থাকেন :

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

গঙ্গায় স্নান করে বাঙালি বিদেশী বর্জনের শপথ গ্রহণ করে। আর সেই গঙ্গার দুই তীর কাঁপিয়ে হাজার কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে : বন্দে মাতরম্। ঐদিন—ঐ চিরস্মরণীয় বেদনার প্রতিঘাতে মিলনের রাখীসূত্র একে অন্যের হাতে বেঁধে দিয়ে বাঙালি প্রতিজ্ঞা নিল : 'ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই।' হলুদ রঙের রাখী হাতে বেঁধে আর কণ্ঠে এই মন্ত্র নিয়ে সকলে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন। রাত্রি প্রভাতের

সেই নব-সঙ্কল্পের তরঙ্গ শহর ছাড়িয়ে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে আছড়ে পড়ে। পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র চলে রাখী বন্ধনের উৎসব। এই উৎসবের পরিকল্পনা ছিল রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের। হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। একজন রাখী হাতে অপরের হাতে রাখী বাঁধে আর বলে, মিলতে হবে, এক হতে হবে। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে, এক জাতি, এক প্রাণ, এক ভগবান।

২২ সেপ্টেম্বর। আবার একটা বিরাট সভা হ'ল টাউন হলে। এবার সভাপতি বাগ্মী লালমোহন ঘোষ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে ইনি বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছিলেন।

২৫ সেপ্টেম্বর। কলিকাতার ময়দানে জনসাধারণ আর স্কুল-কলেজের ছাত্ররা সমবেত হয়েছে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবার জন্য। তারা এসেছে মনের বেদনাকে ভাষা দেবার জন্য। তারা সবাই ছিল নিরস্ত্র। কিন্তু সেই জনতার উপর পুলিশের লাঠি নেমে এল অতর্কিতে। সরকারী দমননীতির সেই প্রথম প্রকাশ।

১৬ই অক্টোবর। মিলন-মন্দিরের (ফেডারেশন হল) ভিত্তি স্থাপন হ'ল। শিলান্যাস করলেন বর্ষীয়ান জননেতা আনন্দমোহন বসু। তিনি তখন বৃদ্ধ, রোগে শয্যাশায়ী। সেদিন তিনি বলেছিলেন :' এর ভিত্তি শুধু একটুকরো মাটির উপর নয়, এর ভিত্তি আমাদের সকলের অশ্রুসিক্ত ব্যথিত হৃদয়ের উপর। ঐ সভায় সবশেষে রবীন্দ্রনাথ জাতির পক্ষ থেকে ঘোষণা করে বলেছিলেন : আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করতে এবং বাঙালি জাতির একতা বজায় রাখতে আমরা সমগ্র বাঙালি জাতি আমাদের শক্তিতে যা কিছু সম্ভব তার সবই প্রয়োগ করব।'

এইভাবে সেদিন নব-জাগরণের প্রাণ-সঙ্গীতে ভাঙা বাংলার আকাশবাতাস ভরে উঠেছিল। এই বছরেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র রংপুরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বাংলার প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যে শঙ্খধ্বনি শোনা গিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল যুবক নৃপেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়ে। সেই বিক্ষুব্ধ বাঙালির চিত্তমথিত আবেগ ও উন্মাদনার ঝড়, সেই খরবেগে প্রবাহিত জাতীয় জীবনস্রোত, আমরা কল্পনা করতে পারি, রংপুরে তরুণ নৃপেন্দ্রচন্দ্রের চেতনায় রীতিমতো উত্তাপ সঞ্চার করেছিল।

আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র

প্রথম পর্ব

'শিক্ষকই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণ। আশা করি শিক্ষার উপকরণ বলাতে শিক্ষকের মর্যাদার কোন হানি হইবে না। উপযুক্ত শিক্ষকের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকা আবশ্যক। শারীরিক গুণের মধ্যে স্পষ্ট ও উচ্চ স্বর, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও তীব্র শ্রবণশক্তি প্রয়োজনীয়।...মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণের মধ্যে প্রথমত ধীর বুদ্ধির প্রয়োজন। বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইয়াও চঞ্চল হইলে শিক্ষাকার্য সুচারুরূপে চলে না।

'দ্বিতীয়ত শিক্ষকের নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি ও কোনও এক শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা আবশ্যক। নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন এই যে, সকল শাস্ত্র পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ও এক শাস্ত্রের কথা অন্যান্য শাস্ত্রদ্বারা উদাহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকিলে শিক্ষক যে শাস্ত্রব্যবসায়ী তাহার বিশদ ব্যাখ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন। কোন এক শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা এই যে, তাহা না থাকিলে গভীর পাণ্ডিত্য কি তাহা জানা যায় না, এবং তাহা না জানিলে তৎপ্রতি নিজের তাদৃশ অনুরাগ জন্মে না, এবং শিক্ষার্থীর মনেও তৎপ্রতি অনুরাগ জন্মান সম্ভবপর নহে। আর এক কারণেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা আছে। যদিও পূর্ব সুধীদিগের অর্জিত জ্ঞান, যাহা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতি বিপুল, কিন্তু জ্ঞান অনন্ত, অতএব নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের সীমা বিস্তার করা শিক্ষার একটি প্রধান কর্তব্য এবং শাস্ত্র বিশেষে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য না থাকিলে সেই শাস্ত্রের নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের শক্তি হয় না।

'বলা বাহুল্য, শিক্ষক মাত্রেরই শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষাবিষয়ক প্রধান গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ (যথা মনু, প্লেটো, রুসো, লক, স্পেন্সর, বেন প্রভৃতি প্রণীত গ্রন্থ) তাঁহাদের পাঠ করা আবশ্যক। সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা, শিক্ষকের প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণ। তাহা না থাকিলে নির্জীব কলের মত শিক্ষাকার্য চলিবে; সজীব আগ্রহের সহিত শিক্ষার্থীর অন্তরে শিক্ষক নব-জীবন সঞ্চার করিতে পারিবেন না।...শিক্ষক ছাত্রের মনে ভক্তির উদ্রেক করিবেন, ভয়ের উদ্রেক করা অবিধি ও অনিষ্টকর। ছাত্রের সহিত সহানুভূতি শিক্ষকের নিতান্ত আবশ্যক। তাহা থাকিলে ছাত্রের অভাব ও অপূর্ণতা শিক্ষক বুঝিতে পারেন এবং বিরক্ত না

হইয়া তাহা পূরণ করিতে সমর্থ হয়েন। তাহার ফলে ছাত্রের মনে ভক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে আকৃষ্ট ও তাহার উপদেশ গ্রহণে সমধিক আগ্রহযুক্ত করেন।'

বাংলার সর্বকালের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আদর্শ শিক্ষক সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন, শিক্ষক নৃপেন্দ্রচন্দ্র সম্বন্ধে এগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। তিনি যে শিক্ষক হিসাবে এইসব গুণের অধিকারী ছিলেন, সেকথা তাঁরাই জানেন যাঁদের কোন না কোন সময়ে তাঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন; তিনি মানুষ তৈরি করবেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন তার কিছু আগেই স্বামী বিবেকানন্দ জলদগম্ভীর স্বরে তাঁর স্বদেশবাসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—তোরা মানুষ হ। এই শতাব্দীর সূচনায় স্বামীজীর এই আবেদন নৃপেন্দ্রচন্দ্রের চিন্তা ও চেতনায় যে দাগ কেটে দিয়েছিল সেটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি তাঁর শিক্ষকজীবন শুরু করেন তখন থেকেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র একমনে বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার শিক্ষার আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম পনের বছর বিভিন্ন সরকারী কলেজে এবং পরবর্তীকালে একাধিক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি কখনও তাঁর লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি। আদর্শের দীপশিখা তিনি কোনো দিনই ম্লান হতে বা নিবতে দেন নি। শিক্ষক হিসাবে এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

আজকের ছোট্ট বৃক্ষশিশু কালকের বিশাল বনস্পতি। ছোট্ট একটি বীজাঙ্কুর মাটি থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই আকাশ জল বাতাস আলো—সবই তার কাছে এসে বলে, তুমি এসেছ? এই তো আমরা! ভয় নেই তোমার। ছোট্ট মানবশিশুও একদিন জন্ম নেয় মায়ের কোলে। তারপর ধীরে ধীরে তার পদপাত ঘটে পূর্ণের প্রাঙ্গণে। শিশু হয়ে ওঠে পূর্ণাবয়ব মানুষ। প্রাণ বেড়ে ওঠে। মন বড় হয়। চিত্ত জেগে ওঠে। মনুষ্যধর্মের মহত্ত্বের আঙিনায় মানবিক অর্জনের নানা আভিজাত্যে ঐশ্বর্যে হয়তো আমরা অনেকেই উন্মীলিত হয়ে উঠতে পারি না। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাণময় বা অন্নময় শরীরের উন্মীলনেও ঐ আকাশ জল বাতাস আলোর মতোই চাই প্রাকৃতিক সাহচর্য। মনের, জ্ঞানের বিকাশের জন্য চাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আরও সুগভীর সহযোগিতা ও প্রাণপাত পরিচর্যা। শিশুবৃক্ষের মতোই শিশুমানবকেও প্রতিমুহূর্তের সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক পরিচর্যায় পূর্ণায়িত ক'রে গড়ে তুলতে হয়। অনুকূল পরিবেশ রচিত না হ'লে মানুষ মানুষ

হয়ে উঠতে পারে না। সময়ের হাতে সমর্পিত হয়ে নিয়তই আমরা হয়ে উঠছি। কার্লাইলের সেই সুন্দর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে: 'We are becoming in every moment of our life since our infancy.' শুধু মানুষ কেন, বিশ্বনিখিলের সমস্ত প্রাণপুঞ্জই নিয়ত আশাবৃত হয়ে উঠছে। কিন্তু মানুষ, যেহেতু সামাজিক দায়ভাগের দায়িত্ব তার মাথায়, জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে একটি সুস্থ সুন্দর অম্বিষ্ট আদর্শের সন্ধানী, দেবত্বের দ্বীপভূমি যেহেতু তার বুকের মধ্যে ও রক্তের গভীরে রয়েছে মানবিক উত্তরাধিকার, তাই স্বাস্থ্যসম্মত স্বাভাবিক উন্মীলনের জন্ত অনুকূল পরিবেশ তার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, এবং এ পরিবেশ রচনার কাজ আরও অনেক বেশী দুরূহ। স্কুল-কলেজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রত্যেকটি ছাত্রের হয়ে ওঠার ইতিহাস (life-becoming)।

সেই ইতিহাস রচনা করেন শিক্ষক; সত্যিকার আদর্শবাদী শিক্ষকই তো তাঁর ছাত্রদের চেতনার চরিত্রের পাপড়িগুলি উন্মীলিত হযে উঠতে সাহায্য ক'রে থাকেন। পরিবেশের সাহায্যটা সেখানে মুখ্য নয়। এই জন্যই তো আমাদের শাস্ত্রে শিক্ষককে বলা হয়েছে আচার্য। কোনো একটি ছাত্রের জীবনে তার শিক্ষানিকেতনের দান বা উত্তরাধিকার তখনি সার্থক হয়ে উঠতে পারে যখন সেই ছাত্রটির সৌভাগ্য হয় তেমন একজন আচার্যের অধীনে শিক্ষালাভ করা যিনি শ্রেয় ও প্রেয়কে মিলিয়ে দিয়ে পূর্ণতার ঐশ্বর্যে তার জীবনকে রচনা করতে পারেন। তাঁকেই আমরা প্রকৃত শিক্ষক ব'লে থাকি যিনি তাঁর চারিত্রিক ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে ছাত্রদের হৃদয় হরণ করতে পারেন। আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র ঠিক এই শ্রেণীরই শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতা তাঁর কাছে একটি বৃত্তি মাত্র ছিল না—এ ছিল তাঁর কাছে একটি ব্রতের তুল্য। তাঁর চরিত্রে গভীরতা ছিল আর সেই সঙ্গে ছিল ব্যবহারের সরল মাধুর্য। এই গুণেই তিনি ছাত্রসমাজে অমন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর একজন বিশিষ্ট ছাত্রের মুখে শুনেছি (ইনি রাজসাহী কলেজে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন) যে, তাঁর মধ্যে যে কর্মনিষ্ঠা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও দৃঢ়তা, আদর্শানুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্য-সচেতনতা দেখা যেত তা বহুলাংশে তাঁর ছাত্রদের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করত। শিক্ষক হিসাবে এইখানেই ছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র একুশ বছর বয়সে আরম্ভ ক'রে সবসুদ্ধ চব্বিশ বছর শিক্ষকতা করেছিলেন। এর মধ্যে সরকারী এডুকেশন সার্ভিসে ছিলেন একটানা চোদ্দ বছর।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পাশ করার ছয়মাস পরেই তাঁর শিক্ষকতার জীবন শুরু হয়। হিসাবমতো ১৯০৬—১৯২১ এই সময়টাই তিনি বিভিন্ন কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন। একুশ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মনেপ্রাণে যোগদান করেন। কিন্তু অনেক দেশপ্রেমিকের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তাঁর ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীজী যখন মাঝপথে বন্ধ ক'রে দিলেন তখন স্বভাবতই ঐ আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়। দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক আন্দোলন—দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের আন্দোলন—নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে আকর্ষণ করতে পারল না। কারণ তিনি ছিলেন একজন খাঁটি গান্ধীবাদী এবং সেই হিসাবে তিনি পরিবর্তনবিরোধী শিবিরে রয়ে গেলেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে পাঁচ বছর কাটিয়ে তিনি আবার তাঁর পুরাতন বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী আট নয় বৎসরকাল কয়েকটি বেসরকারী কলেজে অপেক্ষাকৃত কম বেতনে অধ্যাপনা করেছিলেন। শেষবারের মতো ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একবছর কাল খুলনা বাগেরহাট কলেজে অধ্যক্ষতার কাজে লিপ্ত থেকে তিনি শিক্ষকতা থেকে চিরদিনের মতো অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে সরকারী কলেজের অধ্যাপক হিসাবে তিনি যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, ছাত্রসমাজের কাছ থেকে যে বিপুল শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে যখন তিনি বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজে রত ছিলেন তখন কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। বাংলার বিপুল ছাত্রসমাজে দুই দশকের অধিককাল নৃপেন্দ্রচন্দ্র যথেষ্ট সুনামের সঙ্গেই শিক্ষকতা করেছিলেন এবং তাঁর বহু প্রাক্তন ছাত্রের মুখে এই গ্রন্থের লেখক শুনেছেন যে, সেই সময়ে তাঁর মতো ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক খুব বেশি ছিলেন না। তাঁর বৈদগ্ধ্য বা অধ্যাপনার কৃতিত্ব এর একমাত্র কারণ ছিল না। শিক্ষক হিসাবে তিনি তাঁর ছাত্রদের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন ব'লেই না তাদের কাছে তিনি এমন প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্ম যথেষ্ট না হোক, তাঁর ঋজু চরিত্রের জন্যই তিনি তাদের কাছে অমন শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। উত্তরকালে তাই তো রবীন্দ্রনাথ এই মানুষটিকে বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে পাবার জন্য ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাব বশত কবির এই ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে নি।*

* পরিশিষ্টে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুইখানি চিঠি দ্রষ্টব্য।

'এম. এ. পাশ করার ছয়মাস পরেই আমি বিহার ন্যাশনাল কলেজের (B. N. College, Patna) ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলাম। এই কলেজটি বাবু শালিগ্রাম সিং নামক জনৈক বদান্য রাজপুত স্থাপন করেন। ইনি বিহারের অধিবাসী ছিলেন। কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। আমার নিয়োগ কলিকাতাতেই হয়েছিল। ১৯০৬-এর জুলাই মাসে আমি এই কলেজে যোগদান করি। তখন এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন।' এই কলেজে নৃপেন্দ্রচন্দ্র মাত্র সাতমাস অধ্যাপনা করেছিলেন। এখানে তাঁর সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন ললিতকুমার ঘোষ ও কামাখ্যানাথ মিত্র। এই তিন জনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের ভাব গড়ে উঠেছিল। পাটনায় এসে প্রথম প্রথম তিনি একজন স্থানীয় উকিলের (বাবু বিশ্বেশ্বর সিং) বাড়িতে অতিথি হিসাবে ছিলেন। তারপর তিনি ও ললিতবাবু দুজনে মিলে একটা স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া ক'রে অবস্থান করেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন ঐ সময়ে বিহারে বাঙালিদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল এবং অধ্যাপক হিসাবে তাঁরা বিহারী ছাত্রদের যথেষ্ট সমাদর ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন।

বি. এন. কলেজে তাঁর ছাত্রদের প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন: 'ছাত্রদের আচরণ ও ব্যবহার দুই-ই প্রশংসনীয় ছিল, কিন্তু মজার ব্যাপার এই ছিল যে, তাদের মধ্যে অনেকের বয়স ছিল ত্রিশ বছর। তবে এজন্য আমাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে আমার ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন —তাঁর নাম ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়; ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। এঁর শোচনীয় মৃত্যুর কথা আমি বিস্মৃত হইনি। যে বছর টাইটানিক জাহাজ অতলান্তিক সাগরে নিমজ্জিত হয় ইন্দুপ্রকাশ সেই জাহাজের একজন যাত্রী ছিলেন। আর একজন ছাত্রের নাম মনে আছে—বিশ্বম্ভর দয়াল; ইনি উত্তরকালে পাটনার পাবলিক প্রসিকিউটরের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।...খুব কম সংখ্যক ছাত্রই কলেজের ছাত্র হওয়ার উপযুক্ত ছিল; বেশির ভাগ ছাত্রই ইংরেজীতে কাঁচা ছিল। যারা মফস্বল থেকে আসত তারা ইংরেজী পড়তেই পারত না, বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা। একদিন আমি তাদের ইংরেজী পাঠের পরীক্ষা নিলাম ও তাদের মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট প্রথম ভাগ থেকে পড়তে বললাম। একের পর এক ছাত্র উঠে পড়তে লাগল—পড়া তো নয়, শুধু বিকৃত উচ্চারণজনিত অর্থহীন শব্দের আওয়াজ তাদের কণ্ঠ থেকে নির্গত হতে লাগল। তারা ইংরেজী বলছে না আরবী বলছে তা আমার পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। আসল কথা এই যে তারা বিহারী হিন্দী

যেভাবে উচ্চারণ করত ঠিক সেইভাবেই তারা ইংরেজী উচ্চারণ করত।'

পাটনায় যে সাতমাস ছিলেন বেশ সুখেই ও সুনামের সঙ্গেই ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। তিনি যখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন তাঁর বিবাহ হয়। পাটনায় আসবার অল্পদিন পরে তিনি ও তাঁর বন্ধু ললিতবাবু দুজনেই তাঁদের নব পরিণীতা স্ত্রীদের নিয়ে আসেন ও তখন আর একটি নতুন বাড়িতে উঠেন। তখন পাটনা কলেজে (এটি সরকারী কলেজ) তিনজন খ্যাতনামা বাঙালি অধ্যাপক ছিলেন—যদুনাথ সরকার, জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী ও ডি. এন. মল্লিক। এঁদের সঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র পরিচিত হয়েছিলেন ও সেই পরিচয় স্থায়ী হয়েছিল। পাটনা কলেজে একবার ছাত্রদের একটি সভায় তিনি ও কামাখ্যা মিত্র দুজনে স্বল্প কথায় মিলটন সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কামাখ্যাবাবুও ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন ডি. এন. মল্লিক। 'যতদূর স্মরণ হয় কলেজ লেকচার রুমের বাইরে প্রকাশ্য সভায় সেই আমার প্রথম বক্তৃতা।'

প্রকৃতপক্ষে পাটনা বি. এন. কলেজে শিক্ষকতায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের হাতেখড়ি। নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে তিনি একটু অস্থির প্রকৃতির ছিলেন এবং সবসময়েই পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এখানে তাঁর মন টিকছিল না—কারণ কলেজটির আর্থিক সঙ্গতি তেমন ছিল না। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের তুলনায় এটিকে তাঁর একটি বড় স্কুলের বেশি মনে হ'ত না। কলেজের পরিবেশ বলতে যা বোঝায় তা এখানে ছিল না। ঠিক এই সময়ে তাঁর এক বন্ধুর চিঠিতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র জানতে পারেন যে শ্রীহট্ট রাজ কলেজের জন্য ইংরেজীর একজন ভাল অধ্যাপকের প্রয়োজন এবং সেখানে বেতনও বেশি। তিনি ঐ চাকরিটি গ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি কলিকাতা হয়ে শ্রীহট্ট যাত্রা করেন। শুরু হয় তাঁর শিক্ষকজীবনের দ্বিতীয় পর্ব।

পাটনা থেকে শ্রীহট্ট কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে পত্রালাপে তিনি জেনে নিয়েছিলেন যে, কলিকাতা থেকে গোয়ালন্দ হয়ে সেখান থেকে স্টীমারযোগে প্রথমে যেতে হবে চাঁদপুর। তারপর সেখান থেকে রেলপথে করিমগঞ্জ (এটি শ্রীহট্টের একটি মহকুমা)। তাঁকে জানানো হয়েছিল যে কলেজের একজন বিচক্ষণ পিওন সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে। করিমগঞ্জ থেকে জলপথে প্রায় দুদিন; তারপর তিন মাইল স্থলপথে এবং অবশেষে নৌকায় বারঘণ্টা কাটিয়ে শ্রীহট্ট শহরে উপনীত হতে পারা যাবে। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, এক

বিধবা পিতৃষ্বসা ও বারো বছর বয়স্ক এক ছোট ভাই। তাঁর আত্মজীবনীতে এই তিনদিন অভিযানের এক মনোরম বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। নৌকাযোগে যখন তিনি শ্রীহট্ট শহরের ঘাটে অবতরণ করেন তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে।

'আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল একটি পুকুরের ধারে দুখানি ঘরবিশিষ্ট একটি খড়ের বাড়িতে। বাড়িটি তেমন বড় নয়। কাছেই কলেজের মেস যেখানে দুইজন অধ্যাপকসহ থাকতেন কলেজের অধ্যক্ষ। সাবজজের আবাসটিও আমার বাড়ির সন্নিকটে ছিল। তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ লোক এবং পরিচয়ের পর জেনেছিলাম যে ভদ্রলোক তাঁর প্রথম জীবনে ছিলেন একজন স্কুল মাস্টার। আমার বাবা তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনিও বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। আমি যখন শ্রীহট্টে আসি তখন ভদ্রলোক এখানে সপরিবারে বাস করছিলেন।' শ্রীহট্টে পৌছে প্রথম যে অসুবিধার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল সেটা ছিল রাঁধবার ও খাবার বাসনপত্রের অভাব। তাঁর বাসনপত্রের বিরাট মালটি তখনও পর্যন্ত এসে পৌছেনি এবং জানা গেল যে সেগুলি এসে পৌছতে পনের দিন কিম্বা একমাসও লাগতে পারে। স্থানীয় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বাসনপত্র চেয়ে নিয়ে এই অসুবিধার সমাধান করতে হয়েছিল।

শ্রীহট্টের জমিদার রাজা গিরিশচন্দ্র রায় ছিলেন এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের দৃষ্টিতে এটিকে একটি হাই স্কুল ব'লেই মনে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল স্থানীয় হাই স্কুলেরই কলেজ বিভাগ (ইণ্টারমিডিয়েট) এবং স্কুলের সীমানার মধ্যেই পৃথক দুটি ঘরের মধ্যে কলেজের ক্লাস বসার ব্যবস্থা ছিল। বিজ্ঞানের পঠনপাঠনের জন্য আরো একটি অপরিসর ঘর এর সংলগ্ন ছিল। নামে মাত্রই বিজ্ঞানের ক্লাস হ'ত। একটি লাইব্রেরীও ছিল, কিন্তু সেটি নামেই লাইব্রেরী ছিল, তার বেশি কিছু নয়। কলেজের সব ক'টি ঘরই কাঁচাঘর অর্থাৎ মাটকোঠা ছিল। কলেজ বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ছয় ; তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়াতেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন এখানে অধ্যাপক হয়ে আসেন তখন শ্রীহট্টে পাকা বাড়ি খুব কমই ছিল এবং যে কয়টি ছিল তা স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল। তখনকার শ্রীহট্ট শহর বলতে কাঁচা বাড়ির সমাবেশ। অফিস আদালত, পুলিশ লাইন, কারাগার এসব মিলিয়েই সদর। একটি সরকারী হাসপাতাল ও ছোট্ট একটি সাধারণ গ্রন্থাগারও ছিল। মুসলমানদের যে কয়টি মসজিদ ছিল সেগুলির কিছু জাঁকজমক ছিল। কিন্তু শহরটির একটি বিশেষ সৌন্দর্য ছিল—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের সমষ্টি আর সেই সব পাহাড়ের উপর বাড়িগুলিকে সুন্দর একটি ছবির

মতো দেখাত। বৃদ্ধ রাজা গিরিশচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে একজন জমিদার ছিলেন। বৈষ্ণব হ'লেও তিনি বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন ও ইউরোপীয় আহার পছন্দ করতেন। আমাকে তরুণ বয়স্ক দেখে রাজাবাহাদুর বলেছিলেন যে বহুকাল পূর্বে আমার সমবয়স্ক আর একজন অধ্যাপক এখানে এসেছিলেন; তার নাম কালিকাদাস দত্ত। কালিকাদাস পরবর্তীকালে কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের শ্রীহট্টজীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। 'একদিন সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আহার করার জন্য রাজাবাহাদুর আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। আমি সে নিমন্ত্রণ আনন্দসহকারেই গ্রহণ করি। এটি শিষ্টাচারের চিহ্ন ছিল। রাজার নিবাসে বেশ সৌজন্যের সঙ্গেই অভ্যর্থিত হয়েছিলাম। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রথায় রান্না করা উপাদেয় আহার্য ভোজনান্তে যখন বাড়ি ফিরে আসি তখন আমার তরুণী স্ত্রীর জন্য রাজাসাহেব আমার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ ফল ও চকোলেট দিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি তাঁর গাড়ি পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁরই গাড়িতে আমি প্রত্যাবর্তন করি। কিন্তু পরের দিন আমার কয়েকজন সতীর্থ ও স্থানীয় জজ কোর্টের প্রবীণ ও প্রতিপত্তিশালী সেরিস্তাদার যখন আমাকে বললেন যে রাজবাড়িতে নৈশভোজে যোগদান করার ব্যাপারটি আমি যেন গোপন রাখি—কারণ রাজা জাতিতে একজন সাহা, আর আমি একজন ব্রাহ্মণ, তখন আমি রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলাম। এমন কি তাঁরা আমাকে এমন কথা ব'লে সাবধান ক'রে দিলেন যে, যদি এই বিষয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে আমি যেন একেবারে চেপে যাই—রাজবাড়িতে নিমন্ত্রিত হওয়ার ব্যাপারটা যেন অস্বীকার করি। তা যদি না করি, তাহলে স্থানীয় হিন্দুসমাজে আমার একঘরে হওয়ার সম্ভাবনা। আমি কিন্তু তাঁদের এই পরামর্শ মেনে নিতে পারি নি। তাঁদের আমি বলেছিলাম—আমি তো জীবনে কখনও মিথ্যা বলতে শিখি নি; তাই যাই ঘটুক না কেন, জিজ্ঞাসা করলে আমি সত্যি কথাই বলব।'

শ্রীহট্ট রাজকলেজে নৃপেন্দ্রচন্দ্র মাত্র দুই মাস কাল—ফেব্রুয়ারী ও মার্চ অধ্যাপনা করেছিলেন। তারপরেই তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ঘটনাটি যে ভাবে ঘটেছিল সেটা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নিজের কথাতেই উল্লেখ করছি। 'রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার একদিন কি দুইদিন পরে আমার সতীর্থগণ আমাকে একটি বিজ্ঞাপন এনে দেখালেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের জন্য ইংরেজীর একজন সহকারী অধ্যাপক দরকার। তাঁরা আমাকে ঐ

পদটির জন্য দরখাস্ত করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। আমি যদিও ঐ কলেজ থেকেই এক বছর আগে এম. এ. পাশ করেছি এবং যদিও অধ্যাপক পার্সিভাল আমার সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তথাপি ঐ চাকরিটি পাওয়া সম্পর্কে আমার মনে খুবই সন্দেহ ছিল। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মিস্টার লিট্‌ল। আমি তাঁর কাছেই দরখাস্তটি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এবং একটি তারবার্তায় পার্সিভাল সাহেবকে এই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যাতে তিনি অধ্যক্ষ লিট্‌লের কাছে আমার সপক্ষে একটু সুপারিশ করেন। আমি অবশ্য কিছুই প্রত্যাশা করিনি, কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতে আমি অধ্যক্ষের কাছ থেকে একটি তারবার্তা পেলাম। তিনি আমাকে অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে বলেছেন। তখন আমি রাজাসাহেবকে আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করতে অনুরোধ করাতে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি যখন তাঁকে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা বললাম তখন তিনি সম্মত হলেন।'

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল থেকে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের শিক্ষকজীবনের তৃতীয় পর্বের আরম্ভ এবং তখন থেকেই তিনি বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠতম অধ্যাপক। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। 'চল্লিশ বছর আগে,' নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন অধ্যাপক বা লেকচারারের বিশেষ সম্মান ছিল। এই সম্মান একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী অথবা একজন সিবিলিয়ানের সমতুল্য ছিল বললেই হয়। কারণ, বাছাই করা লোকদেরই এই কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হ'ত যারা যে কোনো পেশায় গেলে পরে অনায়াসেই উচ্চস্থান লাভ করতে সক্ষম।'

১০ই এপ্রিল, ১৯০৭। বেলা এগারোটার সময় চোগা-চাপকানে সজ্জিত হয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। 'তাঁর অফিসের হেড অ্যাসিসট্যান্ট (যিনি আমাকে এই কলেজের একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র ব'লে জানতেন) আমাকে সঙ্গে করে অধ্যক্ষের খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। মিস্টার লিট্‌ল বেশ আমুদে মানুষ এবং গণিতের একজন সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। পরিহাস-রসিক বলেও অধ্যাপক মহলে তাঁর সুনাম ছিল।' নৃপেন্দ্রচন্দ্র এখানে যাঁর ছাত্র ছিলেন সেই অধ্যাপক জে. এন. দাসগুপ্ত তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে হুগলী কলেজে বদলি হয়ে সেখানে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি চলে যাওয়াতেই ইংরেজীর ঐ সহকারী অধ্যাপকের পদটি খালি হয়েছিল। তিনি এখানে বি. এ. অনার্স ও এম. এ. ক্লাস নিতেন। মিস্টার লিট্‌লের সঙ্গে

পরিচিত হওয়ার পর তিনি নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'Prof. Banerjee, would you be prepared to step into Prof. Das Gupta's shoes at once and do you feel yourself competent to take all his classes including the M. A. ?

নৃপেন্দ্রচন্দ্র এতটা আশা করেন নি—তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে বি. এ. এবং এম. এ. ক্লাসে তিনি পড়াবেন। অধ্যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতে তিনি সমর্থ, তবে কলেজের শৃঙ্খলার দিক দিয়ে সেটা ভালো দেখাবে না, কারণ তিনি মাত্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ করেছেন। তিনি নিজে থেকেই প্রস্তাব করেন যে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষকেই (ঢাকা কলেজে তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন; ইনি তখন বদলি হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এসেছেন) এম. এ. ক্লাসের ভার দেওয়া উচিত। অধ্যক্ষ তাঁর এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং তিনি বি. এ. ও এম. এ. ক্লাসে পড়াবেন ঠিক হ'ল। এই ঘটনাটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, নৃপেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রের একটি দিক উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে—তাঁর বিচক্ষণতা ও স্বার্থত্যাগ।

'আমি অধ্যক্ষের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে অধ্যাপকদের বসবার ঘরে ঢুকলাম। সেখানে আমার সকল পুরাতন অধ্যাপকই আমাকে স্বাগত জানালেন। অধ্যাপক পার্সিভাল ছিলেন অল্প কথার মানুষ; তিনি আমাকে দেখে একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করলেন: তা হ'লে তুমি এখানে এসেছ। তাঁরই সুপারিশের জোরে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার নিয়োগ সম্ভব হয়েছিল। সামনেই কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ এবং যদি এটা কোন ব্যবসাদারি শিক্ষায়তন হ'ত তাহলে আমার নিয়োগ নিশ্চয়ই জুন মাসের আগে হ'ত না—জুন মাস থেকেই তো সেশন আরম্ভ।'

বলতে গেলে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করার পর থেকেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রের প্রকৃত অধ্যাপক-জীবনের শুরু। সপ্তাহে দুদিনের বেশি তাঁকে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াতে হ'ত না এবং তাঁর প্রাথমিক লেকচারগুলির বিষয়বস্তু ছিল ইংরেজী কাব্যের রোমান্টিক যুগ ও প্যালগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি অব সঙস্ য়্যাণ্ড লিরিকস, ৪র্থ ভাগ।' তাঁর নিজের স্বীকৃতিতেই আমরা জানতে পারি যে, নৃপেন্দ্রচন্দ্রের লেকচারের ধরনধারণ ও বিষয়বস্তু ক্লাসের ছাত্রদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রমহলে তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। একজন তরুণ অধ্যাপকের জীবনে এটা বড় কম সাফল্যলাভের পরিচয় ছিল না। তখন প্রেসিডেন্সি

কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন, পার্সিভাল, মনোমোহন ঘোষ, ডব্লিউ. সি. ওয়ার্ডসওয়ার্থ (পরবর্তীকালে ইনি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন ; প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হওয়ার পর ইনি অধ্যাপনার পদ পরিত্যাগ ক'রে কিছুকাল ডি. পি. আই. হিসাবে কাজ করেছিলেন), কানিংহাম (ইনি পরে আসামের ডি. পি. আই. পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন) এবং প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। অধ্যাপক ঘোষ প্রেসিডেন্সি কলেজে নৃপেন্দ্রচন্দ্র অপেক্ষা দুই ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। কিন্তু তাঁদের দুজনের মধ্যে আজীবন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তখনকার দিনে অধ্যাপক ঘোষের তুল্য ইংরেজীতে সুপণ্ডিত অধ্যাপক খুব কমই ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি ছাত্রসমাজে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন তখন তার অসংখ্য গুণমুগ্ধ পুরাতন ও নবীন ছাত্র কলেজে তাঁর সম্মানে তাঁর একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তি স্থাপন ক'রে তাদের প্রিয়তম অধ্যাপকের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল তা এই শিক্ষায়তনের ইতিহাসে বিরল বললেই হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের নাম তিনি স্বয়ং তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন। এই তালিকায় এই নামগুলি আমরা পাই : ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশুকুমার হালদার, সুশীল কুমার দে, সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। উত্তরকালে এঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী হয়ে তাঁদের গুরুর গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন তাঁর ছাত্রজীবনের অনেক অধ্যাপকই, যথা প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, আর হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি এখানে স্ব স্ব বিভাগে কর্মরত ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু তখন খুব কম আসতেন। শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক যে কয়জন ছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগের মধ্যেই ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষের ভাবটা প্রবল ছিল এবং এঁরা উপরে অধ্যাপকদের বসবার ঘরে ক্বচিৎ আসতেন। অধ্যাপক জ্যাকসনের মধ্যে বিদ্বেষের ভাবটা যেন প্রবল ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতে এসে আর একটি নতুন জিনিস নৃপেন্দ্রচন্দ্র লক্ষ্য করলেন। সেটি হ'ল প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন ; সরকারী উদ্যোগে পত্রিকাটি সবেমাত্র অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটি একান্তভাবে ছাত্রদেরই উদ্যোগের ফল ছিল।

কলিকাতায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বাসা প্রথমে ছিল ব্রজনাথ দত্ত লেনে। তারপর তিনি উঠে আসেন মেডিকেল কলেজের সন্নিকটে আরপুলি লেনের একটি বাড়িতে। তখনকার দিনে ত্রিশটাকায় দুই-তিনখানা ঘর সমেত বাড়িভাড়া পাওয়া যেত। এইখানে অধ্যাপক দাশগুপ্ত তাঁর অন্যতম প্রতিবেশি ছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র একজন বিশিষ্ট সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর নাম পৃথ্বীশচন্দ্র রায়। ইনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য ও তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। তখন পৃথ্বীশচন্দ্র 'দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড' নামে জাতীয়তাবাদী একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন। সেই পত্রিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বেনামে কিছু পুস্তক সমালোচনা করেছিলেন। বলতে গেলে, এই পত্রিকাতেই সাংবাদিকতায় তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল।

আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র

দ্বিতীয় পর্ব

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সময়েই পাটনা থেকে অধ্যাপক এইচ. আর. জেমস প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হয়ে এলেন। কিছুকাল পরে তিনি ডি. পি. আই.-এর পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্রেরও ঐ কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদে অস্থায়ী নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। তখন ডি. পি. আই. হিসাবে মিস্টার জেমস দার্জিলিঙ থেকে নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে একপত্রে জানালেন যে, সংস্কৃত কলেজে দুইশত টাকা বেতনে ইংরেজীর একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়েছে, তাঁকে সেই পদে সরকার নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর বেতন ছিল মাসিক দেড়শত টাকা। ইতিমধ্যে নতুন পূর্ববঙ্গ সরকারের[১] অধীনে রাজশাহী কলেজ থেকে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের দুইশত টাকা বেতনে স্থায়ী পদে নিযুক্ত হওয়ার কথাবার্তা চলছিল। এমন অবস্থায় তিনি মিস্টার জেমসের পরামর্শ চাইলেন। তিনি কোথায় যোগদান করবেন—সংস্কৃত কলেজে, না রাজশাহী কলেজে? তখন অধ্যক্ষ জেমস তাঁকে রাজশাহী কলেজেই যোগদান করবার পরামর্শ দিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের বিধানে বাঙ্গলা দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছিল।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে নিয়োগের মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'ল। এর অল্পকাল পরেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে আমরা দেখতে পাই রাজশাহী কলেজের অধ্যাপকরূপে। এখন আর সহকারী নয়, একেবারে পুরোপুরি অধ্যাপকের পদেই তিনি নিযুক্ত হলেন। তাঁর অধ্যাপক জীবনের অনেকগুলি বৎসর—১৯০৯ থেকে ১৯১৬ খ্রীঃ—এইখানে অতিবাহিত হয়েছিল এবং এই সাত-আট বৎসরকালই ছিল তাঁর শিক্ষকজীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই বৎসরটি নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনে আরও একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছরের মে মাসে কলিকাতার বাসায় তাঁর প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়েন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

সমগ্র উত্তরবঙ্গে রাজশাহী কলেজ বিখ্যাত ছিল। বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট এই কলেজটির মর্যাদা প্রেসিডেন্সি কলেজের তুল্যই ছিল, একথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন এখানে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আসেন তখন এর ছাত্রসংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশত আর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় যখন তিনি এই কলেজ পরিত্যাগ করেন তখন এর ছাত্রসংখ্যা ছিল এক হাজার। বাঙ্গলা ও বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিষয়েই রাজশাহী কলেজে অনার্সের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে একটি বিষয়ে এই সরকারী কলেজটির পার্থক্য ছিল। পুরোপুরি স্বদেশী নিয়ন্ত্রণাধীনেই ছিল এই কলেজ—অধ্যক্ষ থেকে পিওন পর্যন্ত সকলেই ভারতীয় ছিল। গভর্নিং বডির সভাপতি অবশ্য জিলা শাসকই থাকতেন এবং তখনকার জিলাশাসকের পদে শ্বেতাঙ্গদেরই নিয়োগ করা হ'ত। বহুকাল পর্যন্ত রাজশাহী কলেজে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকই নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। স্বনামধন্য কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ এবং এই শিক্ষায়তনটির যা কিছু উন্নতি তা তাঁরই সময়ে হয়েছিল। রাজশাহীতে ছোটবড় বহু জমিদার পরিবার থাকতেন; তাঁদের ও স্থানীয় ভদ্রলোকদের সমর্থনে কলেজের যে উন্নতি হয় তার মূলে তিনিই ছিলেন। তাই রাজশাহী কলেজের ইতিহাসে অধ্যক্ষ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই কলেজের উন্নতিবিধানে দীঘাপতিয়া ও পুটিয়ার জমিদারদের দানই সর্বাধিক ছিল। তাঁদেরই দানে কলেজ-সীমানার মধ্যে ছাত্রাবাসটি নির্মিত হয়েছিল। এই কলেজের উন্নতিবিধানে আরও একজনের নাম উল্লেখ্য। তিনি রাজশাহীর সুসন্তান ও আধুনিক রাজশাহীর অন্যতম স্রষ্টা রাজকুমার সরকার। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার এঁরই অন্যতম পুত্র ছিলেন।

'রাজশাহী কলেজে আমার যোগদানের চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই এখানে

বিশিষ্ট অধ্যাপকদের সমাবেশ ঘটেছিল যা মফস্বলের একটি কলেজের পক্ষে নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয় ছিল। দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, ইতিহাসে সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, রসায়নে পঞ্চানন নিয়োগী ও আশুতোষ মৈত্র, পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যক্ষ স্বয়ং ও তাঁর সতীর্থবৃন্দ, গণিতে রাজমোহন সেন, ফারসী ও আরবীর জন্য গুলাম ইয়াজদানী; ইংরেজী বিভাগে ছিলেন অধ্যাপক যতীন্দ্র গুহ, অধ্যাপক রমাপদ মজুমদার আর আমি। পরে মিস্টার রহমান নামে জনৈক মুসলিম ভদ্রলোক এই বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন।' এইসব দিক্‌পাল অধ্যাপকের সমাবেশ হওয়ার ফলে রাজশাহী কলেজে শুধু উত্তরবঙ্গের ছেলেরাই ছাত্রহিসাবে ভর্তি হ'ত না। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, মৈমনসিং এমন কি চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা থেকেও ছাত্ররা এখানে আসত। মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা গোড়ার দিকে উল্লেখযোগ্য ছিল না, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের বহু সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান পরিবারের (এদের অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী) ছেলেরা ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করে ও স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে তারা রাজশাহী কলেজে এসে ভর্তি হ'ত। নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন যে, তিনি যখন ঐ কলেজ ত্যাগ করেন তখন এর ছাত্রসংখ্যার ত্রিশ ভাগই ছিল মুসলমান।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক হয়ে আসেন তখন এই শিক্ষায়তনটির নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ দেখে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন: 'কলেজের ছেলের খুবই ভাল ছিল। কোথাও অগ্নিকাণ্ড হ'লে সেখানে ছুটে যাওয়া (তখনও পর্যন্ত রাজশাহীতে ফায়ার ব্রিগেড ছিল না), কেউ পীড়িত হ'লে তার সেবা-শুশ্রূষা করা, শারীরিক উৎকর্ষবিধানে মনোযোগী হওয়া—এই সব ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখা যেত; ছাত্রদের একটি পাঠচক্রও ছিল, সেখানে গীতা, বিবেকানন্দের বক্তৃতা, 'কথামৃত', অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত, আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশী গান ও ঐতিহাসিক নাটকগুলি নিয়ে রীতিমত অনুশীলন হ'ত।...কলেজের খেলাধুলার দিকটিও উন্নত ছিল। সরস্বতীপূজা ও বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে ছেলেরা নিজেরাই রান্না ক'রে দরিদ্রদের ভোজন করাত।'

স্বদেশীযুগের আদর্শ রাজশাহী কলেজের ছাত্রদের ওপর যে বিলক্ষণ প্রভা

বিস্তার করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে এই কলেজের ছাত্রদের কৃতিত্ব খুবই প্রশংসনীয় ছিল। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সময়ে এই কলেজে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনাটির বিস্তারিত যে বিবরণ তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন তা সংক্ষেপে এই। ঘটনাটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে ঘটে থাকবে। রাজশাহী কলেজটি প্রায় পদ্মানদীর তীরেই অবস্থিত। নদীর নিকটবর্তী একটি অঞ্চলে য়ুরোপীয় অফিসারদের কোয়ার্টার ছিল এবং তার অল্প দূরেই হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীদের বসতি ছিল। দীঘাপতিয়ার দুজন জমিদার—কুমার শরৎকুমার রায় ও কুমার হেমন্তকুমারের বাসস্থানও এখানে ছিল। এই অঞ্চলেই দুইটি পৃথক বাড়ীতে বাস করতেন ডঃ পঞ্চানন নিয়োগী ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র। এ দের সন্নিকটেই একজন উচ্চপদস্থ ইঙ্গ-ভারতীয় পুলিশ অফিসার থাকতেন। শহরের যেখানে কলেজের সীমানা শেষ হয়েছে সেখান থেকে কাছারী পর্যন্ত পথের দৈর্ঘ্য দুই মাইলের অধিক। এই শহরটির পাশ দিয়েই নদীর ধার অবধি গেছে পি. ডব্লিউ. ডি.র তৈরি একটি সংরক্ষিত বাঁধ। বাঁধের রাস্তায় শুধু পথচারীদের চলাফেরার অনুমতি ছিল, অন্য কোন প্রকার যানবাহন নিষিদ্ধ ছিল। এই বাঁধটির নীচেই জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে সব রকম যানবাহন ও পদচারীরা যেত। কলেজের অধ্যাপকগণ সকাল-সন্ধ্যায় বাঁধের রাস্তায় দল বেঁধে বেড়াতেন। ইঙ্গ-ভারতীয় পুলিশ অফিসারটি নৃপেন্দ্রচন্দ্রের প্রতিবেশি হ'লেও দেশীয় কারও সঙ্গে মেলামেশা দূরে থাক, বাক্যালাপ পর্যন্ত করতেন না। তিনি স্থানীয় য়ুরোপীয় ক্লাবের সদস্য ছিলেন ও বাঁধের ওপরকার রাস্তা দিয়ে সাইকেলে চড়ে ক্লাবে যেতেন। এটা সম্পূর্ণ বেআইনী ছিল। বাঁধের রাস্তাটি ছিল অনতিপ্রশস্ত। পদচারীদের সঙ্গে সাইকেল আরোহীর সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। যেসব অধ্যাপক ভ্রমণে বেরুতেন তাঁদের অসুবিধা হ'ত। কিন্তু পুলিশ অফিসারটি তা গ্রাহ্যই করতেন না। তাই তাঁকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেবার জন্য ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় (ইনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের একজন প্রাক্তন ছাত্র ও মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী ছিলেন) অবশেষে একটা উপায় ঠিক করলেন।

একদিন সকালে পুলিশ অফিসারটি বাঁধের রাস্তার উল্টোদিক থেকে সাইকেল চালিয়ে যখন আসছিলেন তখন পদচারী অধ্যাপকদের কাছাকাছি হওয়া মাত্র অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তাঁর হাঁটবার লাঠিটি তুলে তাঁর মুখের সামনে ধরতেই সাইকেল আরোহী একেবারে বাঁধের নীচে সাইকেল নিয়ে পড়ে যান। ভূমিশয্যা

থেকে উঠেই তিনি সোজা অধ্যাপকদের কাছে এসে তাঁদের এই মর্মে শাসালেন যে তিনি এই বিষয়টি তাঁর উপরওয়ালা—জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারের দৃষ্টিগোচর করবেন। তিনি অধ্যাপকদের জানতেন। তাঁরাও তাঁকে বলেন যে তাঁর যা খুশি তিনি করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং এটা করা হয়েছিল ডি. পি. আই.-এর বিনা হুকুমেই। অধ্যাপকগণ তাঁদের একজন সতীর্থের প্রতি এইরকম আমলাতান্ত্রিক ব্যবহারের জন্য এতদূর বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরা এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্থানীয় ছাত্রসমাজেও খুব চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তাদের একজন জনপ্রিয় অধ্যাপককে এইভাবে অপমান করার জন্য তারা প্রতি-আঘাত হানবার কথা চিন্তা করতে থাকে। তিন মাস পরে শ্বেতাঙ্গ ডি. পি. আই. তদন্তে এলেন ও আমলাতন্ত্রের আচরণকেই সমর্থন করলেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার—বাঁধটি এরই নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল—বাঁধের সড়কের ওপর আর একটি নোটিশ বোর্ড লাগিয়ে সাইকেল চালানো নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। য়ুরোপীয় অফিসারগণ এজন্য রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ব্যাপারটি শেষপর্যন্ত যখন ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে যায় তখন তিনি কলেজের অধ্যাপকদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে উক্ত ইঙ্গ-ভারতীয় অফিসারটিকেই দোষী সাব্যস্ত করেন ও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর পদে পুনর্বহালের আদেশ দেন। পরে পুলিশ অফিসারটিকে বদলি ক'রে দেওয়া হয়।

এই ঘটনা অপেক্ষা আরও একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঘটনাটি তাঁর নিজের কথায় আমরা উদ্ধৃত করলাম। 'বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বাতিল করবার জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং ভারতবর্ষে এলেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। এই উপলক্ষে দিল্লীতে ১২ই ডিসেম্বর একটি দরবার হয়। ভারতের সকল জেলা শহরে এই দিনটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হয় খেলাধূলা, আলোকসজ্জা ও ব্যায়ামের মাধ্যমে। রাজসাহী শহরে একটি সংযুক্ত য়্যাথলেটিক বোর্ড গঠিত হয়; এই বোর্ডে কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক প্রতিনিধি হিসাবে গৃহীত হয়েছিলেন। সরকারী পুলিশ সুপার মিস্টার কেজি ও রাজশাহী কলেজের একজন তরুণ অধ্যাপক—এই দুজন ছিলেন য়্যাথলেটিক বোর্ডের সেক্রেটারী। শ্বেতাঙ্গ কেজি সাহেব একদিন কলেজে উক্ত অধ্যাপকের কাছে একটি চিরকুট পাঠালেন। পত্রটির ভাষা ও সম্বোধন সবই অশালীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছিল। তিনি সেটি আমাকে দেখালেন ও আমার পরামর্শ চাইলেন

আমি তাঁকে ঠিক ঐ রকম অশালীনভাবেই উত্তর দিতে বললাম। মিস্টার কেজি ত' সেটি পেয়ে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ও অধ্যক্ষের দৃষ্টিগোচরে সেটি নিয়ে আসেন। কিন্তু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাপারে তাঁর যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল সেই কথা স্মরণ ক'রে তিনি নীরব থাকেন।

'দরবারের নির্দিষ্ট দিনটি সমাগত হ'ল। খেলাধূলা ও ব্যায়াম-প্রদর্শন ইত্যাদি কলেজের মাঠেই অনুষ্ঠিত হবে এবং সেজন্য শক্ত বাঁশ দিয়ে মাঠটি ঘেরা হয়। সবশেষে যখন একদিকে কলেজের ছাত্র ও অন্য দিকে পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে দড়ি টানাটানি খেলাটি হয় তখন খেলার শেষে পরাজিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বুঝে পুলিশ কর্মচারীরা উপস্থিত সকলের সামনে ছাত্রদের মারপিট করতে আরম্ভ করে। আমি যখন হস্তক্ষেপ করি তখন একজন পুলিশ কর্মচারী আমার হাত থেকে লাঠিটি ছিনিয়ে নেয়। এটি আমার নিত্য ভ্রমণের সহচর ছিল। আর একজন ঘড়িটা ছিনিয়ে নেয়। আরও দু'একজন অধ্যাপকের অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়। পুলিশের হাতে আমাদের এইভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার সংবাদটা জানাজানি হতেই ছাত্ররা তাদের সংযমের বাঁধ হারিয়ে ফেলে, বেড়া থেকে বাঁশগুলো খুলে নিয়ে পুলিশদের মারধর করতে আরম্ভ করে। উভয় পক্ষেই কিছু সংখ্যক আহত হলে তাদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আহত পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে একজন পরে মারা যায়। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে খেলাধুলা ভেঙ্গে যায়। সমস্ত শহর এই ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শ্বেতাঙ্গ অফিসারগণ হকচকিয়ে গেলেন। তাঁদের আশঙ্কা হ'ল যে, সরকারী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে সরকারের পুলিশের এই সংঘর্ষের বিবরণ যদি বাইরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহলে অফিসারদের শাস্তিভোগ অনিবার্য—বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের রাজা যখন একটি বিশেষ শান্তির বার্তা নিয়ে ভারতে উপস্থিত হয়েছেন। অবশেষে শ্বেতাঙ্গ অফিসারগণ অধ্যক্ষের বাসভবনে এসে কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা আমাদের ওপর দোষারোপের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁরা যখন আমাকে ও আরও দু'একজন অধ্যাপককে এবিষয়ে অনমনীয় দেখলেন তখন তাঁরা কিছুটা ধাতস্থ হন ও 'Let us forgive and forget' ব'লে সমস্ত ব্যাপারটি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেন। তাঁরা আমাদের কাছ থেকে এই আশ্বাস প্রার্থনা করলেন যে, যেন এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গ সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয়। ব্যাপারটির নিষ্পত্তি এইভাবে হয় ও হাসপাতালে নিহত পুলিশ কর্মচারীটি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ব'লে রেজিস্টারে লেখা হয়। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি সমস্ত

ঘটনার বিবরণ ঢাকার একটি ইংরেজী সংবাদপত্রে পাঠিয়েছিলেন ; আমারই এক বন্ধু ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় ঐ সংবাদটি যথাসময়ে উদ্ধৃত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার ফলে রাজশাহীর এই ঘটনাটি সারা বাংলার লোকই জানতে পেরেছিল। কে এই সংবাদ ফাঁস ক'রে দিয়েছে তা জানবার জন্য পুলিশ অনেক চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হয়। আমিই ঐ সংবাদ ফাঁস ক'রে দিয়েছিলাম, কিন্তু পুলিশ সেদিন ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারেনি।'

এই যে দুটি ঘটনার উল্লেখ আমরা এখানে করলাম এর থেকে আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রের যে দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে তার তাৎপর্য গভীরভাবেই উপলব্ধির বিষয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদের পবিত্র বারিসিঞ্চনে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। এই তথ্যটা যদি সরকার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতেন অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর নিয়োগ যদি পূর্ববঙ্গে ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের আমলে হ'ত তাহলে তিনি কখনই সরকারী কলেজে অধ্যাপকরূপে প্রবেশ করতে পারতেন না। ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রামে বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম হিসাবে নৃপেন্দ্রচন্দ্র 'কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ' পদক লাভ করেছিলেন। এহেন একজন ইংরেজ-বিদ্বেষী ব্যক্তিকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যে কেমন ক'রে সরকারী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন, এটি আমলাতন্ত্রের ওপর বিধাতার রহস্যজনক পরিহাস ছাড়া আর কিছু ছিল না। হয়ত এটাই নিয়তির অভিপ্রেত ছিল যে, দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল একাধিক সরকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজে ব্রতী থেকে তিনি হাজার হাজার ছাত্রের অন্তরে আত্মসম্মান ও দেশপ্রেম সঞ্চারিত ক'রে দেবেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পুরোহিত বার্ক, মিলটন, বায়রন, শেলী ও রাস্কিন সম্পর্কে ক্লাসে লেকচার দেওয়ার সময়ে তিনি প্রকাশ্যেই আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানাতেন তাঁর ছাত্রদের কাছে। সরকারী কলেজের একজন অধ্যাপকের পক্ষে এটা সেদিন বড় কম দুঃসাহসের পরিচায়ক ছিল না। তাঁর এই দুঃসাহসের একটি নিদর্শন এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন তখন বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন তার ধূমায়িত অবস্থা অতিক্রম ক'রে প্রজ্বলিত অবস্থায় উপনীত হয়েছে। তারই উত্তাপ থাকত 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তাঁর লেখনীমুখে যে বহ্নিগর্ভ ভাব বিচ্ছুরিত হ'ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর

সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে যেন অনুভব করতেন। পরাধীনতার বেদনা এর আগে দেশের আর কোন সংবাদপত্রে এমন জলন্ত ভাষায় ব্যক্ত হয়নি যেমনটি সেদিন হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকদের ঘরে তাঁদের টেবিলে এই কাগজ প্রতিদিন থাকত। নৃপেন্দ্রচন্দ্র আর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—এই দুজনই ছিলেন এর গ্রাহক। ব্রিটিশসিংহের গুহায় (নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কথায়: 'The Presidency College was meant for training up loyalist administrators and servants of British Imperialism') এই রকম একটি ব্রিটিশ-বিদ্বেষী সংবাদপত্র প্রকাশ্যে এবং তাঁর ইংরেজ সতীর্থদের নাকের ডগায় পাঠ করা রীতিমত দুঃসাহসের কাজ ছিল। সম্ভবত এই কারণেই অমন দুর্লভ প্রাদেশিক এডুকেশন সার্ভিস তাঁর চরণে শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে উঠতে পারেনি।

রাজশাহী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার চার বছর পরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন সেই প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন সারা বাংলায় উৎসবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। রাজশাহীতেও এই উৎসব প্রতিপালিত হয়। আমরা, কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ও শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রের নেতৃত্বে কলেজের কমনরুম হলে একটি সভায় মিলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম ও কবিকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলাম। বক্তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম; রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠকমাত্র আমি ছিলাম না, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমার অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। সেইজন্য আমার বক্তৃতাটি অনেকের কাছেই চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। কিছুকাল পরে আমি ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে গবেষণামূলক একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা করি। সেটি পাঠ ক'রে কলেজে আমার অন্যতম সতীর্থ ও বন্ধু অধ্যাপক ইয়াজদানী চমৎকৃত হন। তিনি সেটি দিল্লীতে সি. এফ. এণ্ড্রুজের কাছে পাঠিয়ে দেন।[১] তিনি সেটি 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। স্থানাভাব বশত সেটি ঐ পত্রিকায় ছাপান সম্ভব হয়নি এবং পরে রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। কিন্তু এই সূত্রে

১। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে ভ্রমক্রমে উল্লেখ করেছেন যে, অধ্যাপক ইয়াজদানী দিল্লী স্টিফেন্স কলেজে এণ্ড্রুজের ছাত্র ও সহকর্মী ছিলেন। ইনি হায়দ্রাবাদ সরকারের হয়ে অজন্তা-ইলোরার সংরক্ষণের গৌরবের অধিকারী।

আমি মহামতি এগুজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম; সেই পরিচয় স্থায়ী হয়েছিল। এটাই ছিল আমার জীবনে পরম লাভ।'

রাজশাহীতে তাঁর অবস্থানকালের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা ছিল বরেন্দ্র-অনুশীলন-সমিতির আবির্ভাব। এই সমিতি বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। দীঘাপতিয়ার কৃতবিদ্য জমিদার কুমার শরৎকুমার রায়, (ইনি পদার্থবিজ্ঞানে এম. এ. পাশ করেছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ইনি নৃপেন্দ্রচন্দ্র অপেক্ষা দুই শ্রেণী উপরে পড়তেন), খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্র ও স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক রমাপ্রসাদ চন্দের সহযোগিতায় বরেন্দ্রভূমির প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য বরেন্দ্র-অনুশীলন-সমিতি এই নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই সমিতির চেষ্টায় উত্তরকালে যে মিউজিয়মটি গড়ে উঠেছিল সেটি শুধু রাজশাহী কেন সমগ্র উত্তরবঙ্গের একটি মূল্যবান সাংস্কৃতিক সংগ্রহশালা ব'লে গণ্য হয়েছিল। লর্ড কারমাইকেল এইটি উদ্বোধন করার জন্য এখানে এসেছিলেন।

বস্তুত রাজশাহীর সুনাম ছিল নানা কারণে; তখনকার দিনে উত্তরবঙ্গে ত' বটেই, এমন কি কলিকাতা ভিন্ন সমগ্র বঙ্গদেশে এমন শিল্প ও সাহিত্যপ্রীতি আর কোন স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হ'ত না। নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন এখানকার কলেজের অধ্যাপক তখন একবার রাজশাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন নাটোরের সংস্কৃতিবান মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় আর সম্মিলনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)। 'এই অধিবেশন', নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন, 'অসামান্যভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল; কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হয়, সেগুলির মধ্যে একটি ছিল অলঙ্কারের উপর, এটির লেখক ছিলেন আমাদের বন্ধু ও সতীর্থ পণ্ডিত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। রমাপ্রসাদ চন্দও গবেষণা-ধর্মী একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সুললিত ভাষায় রচিত মহারাজার ভাষণটিও সমবেত সুধীজনদের তৃপ্তি বিধান করেছিল। মূল সভাপতির ভাষণ আমরা যা প্রত্যাশা করেছিলাম ঠিক সেই রকমই হয়েছিল। বীরবলের নিজস্ব এবং অননুকরণীয় ভঙ্গিতে রচিত ভাষণটি সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন।'

কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র একটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সেটি হ'ল, ১৯১০-খ্রীষ্টাব্দে কলেজের ছাত্র কর্তৃক দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' নাটকের অভিনয়। স্বদেশী আন্দোলনের রেশ

তখনও বাঙ্গলার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে মিশেছিল। কলেজের ছাত্রদের মনে জাতীয়তার চেতনা কত গভীর ছিল এই নাটক-নির্বাচন থেকেই আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি। একটি সরকারী কলেজের ছাত্রদের পক্ষে এটাও কম দুঃসাহসের কাজ ছিল না। 'প্রকৃতপক্ষে যে সাড়ে সাত বৎসরকাল আমি রাজশাহীতে অতিবাহিত করেছিলাম ঐ সময়টা এমন সব চিত্তাকর্ষক ঘটনাবহুল ছিল যে সে সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখলে কয়েক খণ্ড হতে পারে। শহরের সুখদুঃখ ও আনন্দবেদনার সঙ্গে আমি যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম।' রাজশাহীর সাড়ে সাত বৎসরকালের স্মৃতি আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের শিক্ষকজীবনে অম্লান ছিল বললেই হয়। তাঁরই সময়ে এই সরকারী কলেজটি যেন একটি জাতীয় কলেজে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এইখানকার কলেজ পত্রিকাতে তাঁর একটি বিখ্যাত রচনা 'Culture and Anarchy' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। তাই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি করা হয় তখন রাজশাহী কলেজের সতীর্থগণ ও ছাত্রবৃন্দ যেমন বেদনা বোধ করেছিলেন তেমনই বেদনা বোধ করেছিল স্থানীয় বিশিষ্ট অধিবাসিবৃন্দ। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, কলেজের লেকচার-রুমের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জনপ্রিয়তা স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু বিদগ্ধজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। 'প্রফেসর নৃপেন ব্যানার্জী'—এই নামটি তখন থেকেই সারা বাঙ্গলার ছাত্রদের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। অধুনা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর স্মরণে প্রতি দুবৎসরে এক বক্তৃতামালার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে—বিষয়বস্তু 'বাঙ্গলার সংস্কৃতি ও কলা'।

দ্বিতীয়বার তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সাত মাসের বেশী ছিলেন এবং এই সময়ে যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁকে কৃষ্ণনগর কলেজে বদলি করা হয়েছিল সেটি এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই ছিল স্বাধীনচিত্ততা এবং ছাত্রজীবন থেকে শুরু ক'রে কি রাজনৈতিক, কি সাংবাদিক জীবনে, সর্বত্র নৃপেন্দ্রচন্দ্র এর পরিচয় দিয়েছেন। সরকারী চাকরি করতে গেলে যে একটু দাসসুলভ বা বিনম্র মনোভাবের পরিচয় দিয়ে উপরওয়ালার মনোরঞ্জন করতে হয় এই জিনিসটা তিনি কোনদিনই বুঝতেন না। আবার এই বিশেষ গুণটির জন্যই ত' তিনি বাঙ্গলার বিপুল ছাত্রসমাজে সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'মাস্টার মহাশয়' রূপে সম্পূজিত হয়েছিলেন। যাই হ'ক এবার এসে তিনি দেখলেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যে তরুণ ইংরেজ তাঁর সতীর্থ ছিলেন সেই

মিস্টার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তখন এখানকার অধ্যক্ষ আর ইংরেজী বিভাগের প্রধান জনৈক মিস্টার স্টার্লিং। সেকালে যে সব অল্পবয়সী ও অনভিজ্ঞ সাহেবকে এদেশের শিক্ষাবিভাগে চাকরি দিয়ে বিলেত থেকে পাঠানো হ'ত মিস্টার স্টার্লিং ছিলেন তারই এক দৃষ্টান্ত।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র এঁর সম্পর্কে লিখেছেন: 'প্রকৃত পাণ্ডিত্য বলতে যা বোঝায় মিস্টার স্টার্লিংয়ের তা আদৌ ছিল না। ইনি একজন রিক্রুটিং সার্জেন্ট কিম্বা একজন পুলিশ বা এগজিকিউটিভ অফিসার হতে পারতেন; কিন্তু আমার বিবেচনায় শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন।' তিনি আরও দেখতে পেলেন যে নবাগত তরুণ অধ্যাপকদের অনেকেই যেন ইংরেজ অধ্যাপকদের যেমন ছিলেন বশম্বদ তেমনই বিভাগীয় প্রধানদের সম্পর্কে তাঁরা প্রকাশ করতেন দাসসুলভ মনোভাব। এইটা নৃপেন্দ্রচন্দ্র আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না। নতুন অধ্যক্ষের কাছে তিনি যেভাবে গৃহীত হলেন তাতে তিনি যেন একটু দমে গেলেন। 'মিস্টার ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ এমন ভাব দেখালেন যে তিনি আমাকে তাঁর একজন পুরাতন সতীর্থ ব'লে চিনতেই পারলেন না। দশ বছর আগে কলেজের বিভিন্ন সেকশনের ছাত্রদের কাছে আমরা দুজনেই রাসকিনের বই পড়াতাম। আমি যখন তাঁকে আমাদের পুরাতন সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম, মনে হ'ল সেটা যেন তিনি আদৌ পছন্দ করলেন না। এই মানুষটিকে দেশীয় অনেক সিনিয়র অধ্যাপকদের (যাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর চেয়ে দক্ষ ছিলেন এবং কারও কারও ছিল বিলাতী ডিগ্রী) মাথার উপরে যেন বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মুকুটটি তাঁর মাথায় ঠিকভাবে বসেনি। বিভাগীয় প্রধান মিস্টার স্টার্লিংকে মনে হ'ল তিনি যেন অন্যের কাজে অযথা হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন। এটা আমার কাছে বিসদৃশ মনে হ'ত।'

সংসারে যারা অযোগ্য হয় তাদের প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় যে তারা অন্যের উপরে মাস্টারি করতে অথবা নিজের ত্রুটি ঢাকবার জন্য একটা অর্থহীন মাতব্বরির ভাব প্রকাশ করতে সব সময়েই উদ্যত। মিস্টার স্টার্লিং ছিলেন সেই প্রকৃতির একজন অধ্যাপক। নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে তিনি মনে করেছিলেন একজন সাকরেদ ব'লে; তাই লেকচার দেওয়া বা টিউটোরিয়াল ক্লাস নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তাঁকে কিছু উপদেশ দিতে চাইলেন। তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে এসব উপদেশ যে অবান্তর, বিভাগীয় প্রধানের মাথায় সেটা ঢুকিয়ে দেবার জন্য তিনি একদিন বললেন: 'I am not a greenhorn and I have to tell you that I was an old boy of the College and had been professor

here ten years ago; I know all its ins and outs.' একজন ইংরেজ অধ্যাপকের পক্ষে একজন দেশীয় অধ্যাপকের এই রকম স্পষ্ট ভাষণ বা স্বাধীন মনোভাব বরদাস্ত করা একটু কঠিন ছিল বৈ কি।

'মিস্টার স্টার্লিং অথবা মিস্টার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কাউকেই গ্রাহ্য না ক'রে আমি আমার কাজ করতে লাগলাম। এ ত' আমারই পুরাতন শিক্ষায়তন, এখানেই ত' আমি ছাত্রজীবনে বহু জিনিস শিক্ষা করেছি এবং দশ বছর আগে এখানেই আমি স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা করেছি।' দ্বিতীয়বার এখানে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে তাঁর পূর্বের স্বাধীন মনোভাব বিসর্জন দেওয়া কঠিন ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ক্লাসে ছাত্রদের কাছে ইংরেজী কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়াতেন। তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্র-কবিতা কলেজের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে; সেই যুদ্ধে সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে ইংরেজকে সাহায্য করা উচিত কিনা, সে বিষয়ে তিনি ছাত্রদের প্রবন্ধ লিখতে বলতেন; কখনও বা ভারতের দারিদ্র্যসমস্যা, বর্ণবৈষম্য অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে বলতেন। সচরাচর সরকারী কলেজের অধ্যাপকরা তাঁদের ছাত্রদের কাছে প্রবন্ধের জন্য এই ধরনের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে সাহস পেতেন না।

'একদিন অধ্যক্ষের হেড য়্যাসিস্‌ট্যান্ট অধ্যাপকদের ঘরে এসে আমাকে যেন কিছুটা হুকুমের ভঙ্গিতে বললেন, প্রফেসর ব্যানার্জী, তাড়াতাড়ি আপনার ক্লাসে চলে যান। লেকচার শেষ ক'রে অধ্যাপকদের ঘরে এসে আমি সত্যই একটি দৃশ্যের অবতারণা করেছিলাম। সতীর্থদের প্রত্যেককেই আমি বলেছিলাম যে আমি এক্ষণই অধ্যক্ষকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যে, তাঁর অফিসের একজন কর্মচারীকে কি অধ্যাপকদের কাজের খবরদারি করবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে?' বস্তুত এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক মহলে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকেই বিষয়টি উপেক্ষা করতে বলেন, কিন্তু নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কাছে এটা একটা সম্ভ্রমের বিষয় মনে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষকে অধ্যাপকদের ঘরে এসে উক্ত কর্মচারীর আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।'

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যক্ষ এই দুই শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে মন কষাকষির ফলে স্যার আশুতোষ তাঁর আগ্রহ সত্বেও নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের লেকচারার রূপে পেতে পারেন নি। তাঁরা বাধা দিয়েছিলেন. ঠিক এই সময়ে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ গিলক্রাইস্ট ইংরেজীর একজন উপযুক্ত

অধ্যাপক চেয়ে ডি. পি. আই.-কে পত্র দিলেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বন্ধু রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরেজীর সিনিয়র অধ্যাপক ছিলেন। কথিত আছে যে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ওটেন'-সম্পর্কিত ঘটনার পর শাস্তি হিসাবে তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কৃষ্ণনগর কলেজে বদলি করা হয়। অধ্যাপক ঐ কাজে ইস্তফা দেন। সেই শূন্যস্থানে পাণ্ডিত্য ও প্রশাসন—এই দুই বিষয়ে একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ অধ্যাপকের প্রয়োজন হওয়াতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র অতঃপর কৃষ্ণনগর কলেজে বদলি হন। এই বদলিটা আসলে স্টার্লিং ও ওয়ার্ডসৃওয়ার্থের মিলিত উত্তোগের ফল ছিল।

এই ঘটনার পর নৃপেন্দ্রচন্দ্র একদিন সন্ধ্যায় স্যার আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা তাঁর রসা রোডের বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করতেন। বাঙ্গলার এই অদ্বিতীয় শিক্ষাগুরুর প্রতি তিনি চিরকাল একটি প্রবল আকর্ষণ বোধ করতেন। তাঁকে হঠাৎ কৃষ্ণনগরে বদলি করার ব্যাপারটা আশুতোষের গোচরে আনতেই তিনি নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। আজ যা খারাপ মনে হচ্ছে কাল তাই-ই ভাল মনে হতে পারে। 'বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানের এই উক্তি আমার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছিল। এইসব শ্বেতাঙ্গদের চক্রান্তে শিক্ষকজীবনে আমি যদি একস্থান থেকে স্থানান্তরে বদলি না হতাম, আমি যদি এদের জাতিগত ঔদ্ধত্যের শিকার না হতাম, তাহ'লে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমি দাসত্ব-শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর শিক্ষকজীবনের প্রথম পর্বে যেমন দ্বিতীয় পর্বেও তেমনই নৃপেন্দ্রচন্দ্র কয়েকজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা উত্তরকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান ক'রে তাঁদের আচার্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। এই তালিকায় আমরা এই কয়জনের নাম পাই, যথা—মহম্মদ হাসান, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, বি. বি. রায়, নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, এইচ. এল. দে প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে রাজসাহী কলেজে যেসব ছাত্র তাঁর অধীনে পাঠ গ্রহণ ক'রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বিশেষভাবে কয়েকজনের নামোল্লেখ করেছেন, যথা—ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, কালিকারঞ্জন কানুনগো, আশুতোষ লাহিড়ী, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্র ঘটক। এঁদের মধ্যে কয়জন এখনও আমাদের মধ্যে আছেন। তাঁদের কাছে শিক্ষক নৃপেন্দ্রচন্দ্র সম্বন্ধে এই

গ্রন্থের লেখক যেসব কথা শুনেছেন তার মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, এঁরা সকলেই আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নিবিড় স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট পাঠনের ভঙ্গি সকলের মনেই গভীর ছাপ রেখেছিল। তিনি তন্ময় হয়ে কাব্যের রসে মগ্ন হয়ে যেতেন এবং ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে সে কাব্যরস পরিবেশন করতেন। কখনও কখনও মিলটনের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়ে তিনি ছাত্রদের হৃদয়-মন এক বিচিত্র কাব্যচেতনায় অভিষিক্ত ক'রে দিতেন। একজন ছাত্র বলেছেন, 'মাস্টার মহাশয় ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে সর্বদা মিষ্টভাষী ছিলেন এবং তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ছিল অকৃত্রিম। তিনি ক্লাসে যেভাবে আমাদের "প্যারাডাইস লস্ট" বা শেলির কবিতা পড়াতেন, তেমন সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী পাঠন আমরা আর কখনও শুনিনি।' আর একজন ছাত্র বলেছেন: 'যে যুগ এমন ছাত্রগত প্রাণ, বিদ্যাবিদগ্ধ আচার্য ও শিক্ষক সৃষ্টি করেছিল, সেই যুগ আজ গত হয়েছে। এমন পূর্ণাঙ্গ খাঁটি মানুষের আর দেখা পাওয়া যায় না।' বলা বাহুল্য, নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মতো এই আদর্শ আচার্যেরা চিরকাল ছাত্রসমাজের আন্তরিক হৃদয়োৎসারিত পূজা লাভ করবেন।

গোবিন্দচন্দ্র তখন সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, যখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতার বাসায় তিনি তাঁর মা ও বাবাকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি অত্যন্ত পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কৃষ্ণনগর কলেজে বদলি হওয়ায় কলিকাতার বাসা উঠিয়ে দিয়ে মা ও বাবা এবং অন্যান্য পরিজনবর্গকে নিয়ে তাঁকে নতুন জায়গায় চলে আসতে হ'ল। এই কলেজে তিনি দু'বছর অধ্যাপনা করেন। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন অর্থনীতি-বিভাগের লোক; রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে পাঠ্য বইয়ের লেখক। কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল তিনশত আর অনার্স বিষয়গুলির মধ্যে ছিল মাত্র তিনটি, যথা—ইংরেজী, অঙ্ক ও সংস্কৃত। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। এখানেও তাঁর প্রখর আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই কলেজে তিনি কয়েকজন সতীর্থকে সহকর্মী পেয়েছিলেন।

তিনি যখন কৃষ্ণনগর কলেজে তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ সংগ্রামের জয়তিলক ললাটে ধারণ ক'রে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেছেন ও চম্পারণে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখন থেকেই মনে মনে গান্ধীভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কলেজে ছাত্রদের দুইটি সাহিত্য-সমিতি

ছিল—একটা ইংরেজী সাহিত্যের ও অপরটি বাংলা সাহিত্যের। উভয় সমিতির ছাত্ররা তাঁর প্রতি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিল। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্ররা যখন তাদের সমিতি বা ইউনিয়নে নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রণ করত তখন তিনি তাদের সামনে গান্ধীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরতেন এবং বলতেন: 'বিদেশীদের কাছ থেকে আমাদের নতুন ক'রে শিখবার কিছু নেই, বরং যা কিছু শিখেছি তা এখন ভুলে যাওয়া দরকার।' ছাত্রদের এইসব সভায় অধ্যক্ষ গিলক্রিস্ট অনেক সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর পক্ষে একটি সরকারী কলেজের এইরকম উক্তি বরদাস্ত করা কঠিন ছিল।

আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি যখন যে কলেজে গিয়েছেন তখন সেখানে ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রাণের প্রবাহ সৃষ্টি করতেন। কেবলমাত্র ক্লাস-রুমে লেকচার দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করতেন না, এমনকি গতানুগতিক পদ্ধতিতেও তিনি ঐ কাজ করতেন না। সরকারী কলেজের সঙ্গে স্থানীয় শিক্ষিত বা কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের যোগাযোগ ক্বচিৎ থাকত। কৃষ্ণনগর কলেজের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে ছাত্ররা যেন বৃহত্তর জীবন-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছাত্রদের এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। তাদের বাংলা সাহিত্য-সমিতিটিকে কেন্দ্র ক'রে তিনি কলেজে নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন এবং সেইসব অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট ও সংস্কৃতিবান অধিবাসীদের নিমন্ত্রণ করাতেন। ফলে যাঁরা এতকাল এই কলেজের সীমানায় বড়-একটা ঘেঁষতেন না তাঁদের সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে। সম্ভবত তাঁর এই উদ্যমকেও শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেননি।

নদীয়া জেলায় ফুলিয়াতে কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অমৃতধারায় বাঙ্গালী পাঠকের চিত্ত সরস ও স্নিগ্ধ হয়েছে—কৃত্তিবাস তাই বাঙ্গালীর সর্বকালের গৌরব ও গর্বের পাত্র। অথচ তাঁর স্মৃতিপূজার কোন ব্যবস্থা ছিল না—একালের বাঙ্গালীর কাছে তিনি বিস্মৃত ও উপেক্ষিত বললেই হয়। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কলেজের কয়েকজন সতীর্থদের নিয়ে এবং কৃষ্ণনগরের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যতীন্দ্রমোহন সিংহ ও জিলা ইঞ্জিনীয়ার যতীন্দ্রনাথ সেনের সহযোগিতায় কৃত্তিবাস-স্মারক সমিতি গঠন করেন। তাঁর ছাত্ররা এই ব্যাপারে খুবই উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর সেই উৎসাহী ছাত্রদের মধ্যে কবি ও দেশসেবক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন। কৃত্তিবাসের জন্মভিটা

ফুলিয়াতেই এই স্মরণ-উৎসব সম্পন্ন হয়েছিল। কৃষ্ণনগরে থাকবার সময়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র মাঝে মাঝে কলেজের ছাত্রদের নিয়ে নৌকাযোগে নবদ্বীপ যেতেন। আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি ঠিক সেই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন যাঁদের আমরা বলে থাকি মানুষ-গড়ার কারিগর। শুধু কেতাবী শিক্ষাদান করে ছাত্রদের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে দেওয়া চলে না—একথা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাই ছাত্রদের মধ্যে সেবাধর্মের ভাবটাও তিনি জাগিয়ে দিতেন। বাঙ্গলায় ছাত্রদের নৈতিক জীবন উন্নত ক'রে তোলার জন্য তাদের মধ্যে জনসেবার ভাবটা প্রথম জাগিয়ে দেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। নৃপেন্দ্রচন্দ্রও এই জিনিসটার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। তাইত' দেখি কৃষ্ণনগরে এসেও তিনি ছাত্রদের দিয়ে দুঃস্থদের পরিচর্যা করানো প্রভৃতি কাজে সক্রিয় অংশ নিতেন। মুষ্টিভিক্ষা ক'রে দরিদ্র রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করা, চাঁদা আদায় করা এইসব ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের খুবই উৎসাহ দিতেন। এইভাবেই তিনি তাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি ক'রে দিতেন। ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনচিন্তার বিকাশ হ'ক, এটাই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য।

কৃষ্ণনগরে যে দু'বছর তিনি ছিলেন ঐ সময়ে কলেজের বাইরে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবন বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হয়েছিল, তিনি নিজেই এই কথা বলেছেন। কিন্তু কলেজের ভেতর ক্রমেই যেন তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। অধ্যক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ ক্রমেই আসন্ন হয়ে আসছিল; তাঁর স্বৈরাচারী মেজাজ তাঁর ও তাঁর সমধর্মী সতীর্থদের কাছে ক্রমেই অসহনীয় মনে হতে থাকে। এমন কি কলেজের পিওন ও বেয়ারাগুলো পর্যন্ত অধ্যাপকদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করত না। এর ফলে একদিন অধ্যাপকদের কাউন্সিল মিটিংয়ে (এই সভায় অধ্যক্ষই সভাপতিত্ব করতেন) নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও তাঁর দুই-একজন সতীর্থ অধ্যক্ষের মুখের ওপর বলেছিলেন: **'We have no further taste for working with you and will welcome a speedy transfer.'** শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ এর আগে এমন স্পষ্ট কথা কখনও শোনেননি। প্রত্যেকটি সরকারী কলেজে একটি ক'রে গভর্নিং বডি থাকত; তাঁর সভাপতি হতেন জিলা শাসক আর সদস্যদের অধিকাংশ স্থানীয় ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় থেকে গৃহীত হতেন। এই সদস্যদের অধিকাংশই বশংবদ মনোভাবের পরিচয় দিতেন, অধ্যক্ষের খোশামোদ করে চলতেন। ফলে সরকারী কলেজের পরিচালন-ব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষের বিচার-বিবেচনাহীন আধিপত্যই বজায় থাকত। অধ্যাপকদের স্বাধীনভাবে কোন কিছু করার উপায় থাকত না। যদি কেউ করতেন তাহ'লে তাঁকে অধ্যক্ষের বিষনজরে পড়তে হ'ত। এইজন্য সরকারী কলেজের

অধিকাংশ অধ্যাপকই যেন মেরুদণ্ডবিহীন ছিলেন ও ছকবাঁধা কাজ ক'রে তাঁদের দায় সারতেন। এই ছিল অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পনের বছরের শিক্ষকতার তিক্ত অভিজ্ঞতা।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ ক'রে তিনি বদলি হয়ে এলেন চট্টগ্রাম কলেজে। এখানেও তিনি দু'বছর অধ্যাপনা করার পর সরকারী কর্মে ইস্তফা দিয়ে দেশের কাজে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, আত্মনিয়োগ করেন। এখানে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য হয়েছিল। কলেজে অধ্যাপনা ভিন্ন তিনি রাঙামাটির রাজা ভুবন-মোহন রায়ের পুত্র কুমার নলিনাক্ষ রায়ের অভিভাবক-শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কুমারবাহাদুর তখন সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে প্রবিষ্ট হয়েছেন। এখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থাও রাজাবাহাদুরের একটি বাংলোতে নির্দিষ্ট হয়েছিল। চট্টগ্রামের কলেজটি যে খুব আকর্ষণীয় ছিল তা নয়। এখানে অনার্সের বিষয়গুলির মধ্যে ছিল মাত্র তিনটি, যথা—ইংরেজী, সংস্কৃত ও পালি। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে একলক্ষ ছিল বৌদ্ধ; সম্ভবত সেই কারণে তাদের জন্য কলেজে পালিভাষার পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল। তবে এখানে অধ্যক্ষ থেকে অধ্যাপক সবাই ছিলেন ভারতীয়। অধ্যক্ষের পদে ছিলেন পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু; তিনি তখন ঐ পদে অস্থায়ীভাবে বহাল ছিলেন। চমৎকার ভদ্রলোক; অধ্যাপকদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে তিনি কোন কিছু করতেন না। গভর্নিং বডির প্রেসিডেণ্ট ছিলো চট্টগ্রাম ডিভিসনের কমিশনার সিবিলিয়ান কে. সি. দে। 'তাঁর এবং আমার মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর প্রবোধচন্দ্র দে (ইনিও একজন সিবিলিয়ান; প্রবোধ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. ক্লাসে আমার সহপাঠী ছিল।' তাঁর সময়ে এখানে অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। এখানেও তিনি মিস্টার দে-কে সভাপতি ক'রে একটি ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করেন ও ছাত্রদের কলেজের পাঠ্যবহির্ভূত বিবিধ সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করেন। খেলাধুলার বিভাগটিও তিনি নতুন ক'রে গঠন করেন এবং এই ক্ষেত্রেও তিনি তাদের মধ্যে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন।

ছাত্রদের নৈতিক উৎকর্ষবিধানের দিকে নৃপেন্দ্রচন্দ্র সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাঙ্গলার সরকারী কলেজগুলিতে ছাত্রজীবনকে বিষাক্ত ক'রে দেবার জন্য তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দেবার অপচেষ্টা চলত। তিনি যে কলেজে গেছেন সেখানেই ছাত্রদের মনকে সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করতেন এবং এই দিক দিয়ে আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের শিক্ষকজীবন

বিশেষভাবে গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবই তাঁকে সেদিন বাঙ্গলার বিপুল ছাত্রসমাজের কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র ক'রে তুলেছিল।। ছাত্রদের তিনি যে কিরকম স্নেহ করতেন, তাদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষবিধানে তিনি কতখানি আগ্রহী ছিলেন সেই ইতিহাস কোনদিনই বিস্মৃত হবার নয়।

চট্টগ্রাম তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে নানা কারণে। প্রথমত, এইখানেই কর্মরত থাকার সময়ে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরিচিত হন। দ্বিতীয়, নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ীতে প্রতিবৎসর সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব হ'ত। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সেই পারিবারিক পূজা স্বগ্রামে অনুষ্ঠিত না হয়ে তাঁর চট্টগ্রামের বাসায় তেমনই সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়েছিল। যে দুবছর তিনি কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন সেই সময়ের মধ্যে সমগ্র চট্টগ্রাম জিলায় তিনি সর্বত্র সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। এখান থেকেই তিনি তাঁর রাজসাহীর ছাত্র সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের স্মরণীয় অধিবেশনে যোগদান করবার জন্য নাগপুরে গিয়েছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্র একই সঙ্গে নাগপুর যাত্রা করেছিলেন। তাঁর এই ছাত্রটিও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাগপুরেই তিনি মহাত্মা গান্ধীকে সর্বপ্রথম দেখলেন ও তাঁর ভাষণ শুনে তাঁর জীবনের কর্তব্য স্থির করেন। কাঁধ থেকে সরকারী চাকরির গুরুভার জোয়াল নামিয়ে ফেলে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সামিল হবেন—এই সিদ্ধান্ত নিয়েই নৃপেন্দ্রচন্দ্র নাগপুর থেকে চট্টগ্রামে ফিরেছিলেন। চট্টগ্রাম তাঁর জীবনে দিক্-পরিবর্তন সূচিত ক'রে দিয়েছিল।

চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব কিছুকাল তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। মহামতি বালগঙ্গাধর তিলকের তিরোধান-সংবাদে ছাত্ররা শোক পালন করে। এঁদের পুরোভাগে ছিলেন অনেকে যাঁরা অসহযোগ আন্দোলন, পরে চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার আক্রমণ ও তৎপরবর্তী অধ্যায়ে নায়ক ছিলেন—সূর্য সেন, শৈলেন চৌধুরী এঁদের প্রধান।

রাজনৈতিক আবর্তে নৃপেন্দ্রচন্দ্র

১ম পর্ব

গাহ জয়, গাহ জয় !
পোহাল দুঃখ-শর্বরী, উদিছে জ্যোতির্ময়
গাহ জয়, গাহ জয় !
পরি চন্দনটীকা ললাটে, জাগে অভয়,
গাহ জয়, গাহ জয় !
মুক্তিপথের হে যাত্রী, সত্যকবচে অক্ষয়
গাহ জয়, গাহ জয় !
... ...
পতাকা তুলিয়া ধর, গাহ স্বদেশের জয়
গাহ সত্যের জয়
গাহ প্রেমের জয়
গাহ শক্তির জয়
কোটি কণ্ঠে গাহ জয় জয় !'

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন শেষবারের মতো রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হয়ে সাত মাসের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তখন আলীপুর কারাগারে তিনি কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। 'কারার ফুল' কাব্যগ্রন্থটি তারই ফল। 'সন্ধ্যামালতী' ও 'রক্তজবা' এই দুই অংশে কাব্যটি বিভক্ত। এই কবিতাটি 'কারার ফুল' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর অন্তরের দেশপ্রেম এই কবিতাটির প্রতিটি চরণে যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। তাঁর স্বদেশপ্রেম এখানে এমন সরলভাবে ও সরল ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে যে তা সহজেই পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে। এইবার আমরা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। কিন্তু তার আগে ভারতের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ, বিস্তার ও পরিণতি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার। তাঁর জীবনের রাজনৈতিক পটভূমিকাটি বুঝবার পক্ষে এটি সহায়ক হবে।

ভারতের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে ও জাতীয় আন্দোলনে আমরা প্রধানত

চারটি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য ক'রে থাকি। প্রথম—রামমোহনের সংস্কার-যুগ; দ্বিতীয় —কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন ও সহযোগিতার যুগ; তৃতীয়—স্বদেশী-আন্দোলন-জনিত প্রতিবাদ-যুগ; চতুর্থ—মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-অসহযোগ-যুগ। নৃপেন্দ্রচন্দ্র দেশপ্রেমের দীক্ষা নিয়েছিলেন স্বদেশীযুগের সাগ্নিক ভাবধারা থেকে, কিন্তু উত্তরকালে গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তার আদর্শেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ধাঁচটা পুরোপুরি গঠিত হয়েছিল। তাই আমরা দেখতে পাই যে, তিনি যুগপৎ বিপ্লবে অর্থাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহে বিশ্বাসী এবং খাঁটি অহিংসবাদী বা গান্ধীবাদী ছিলেন।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ভারত-শাসনভার গ্রহণ থেকে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত (১৮৫৮—১৮৮৫ খ্রীঃ) রামমোহনের যুগের প্রসার। রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণদাস ও হরিশচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ এই যুগের প্রবর্তক। ভারতে ইংরেজশাসনের সূচনাকাল থেকে শাসকজাতির অন্ধ অনুকরণের ফলে ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার ও ধর্মহীনতার প্রবল বন্যা এসেছিল রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ক'রে তার বেগ অনেকখানি নিরস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারপরে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে জাতি অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে থাকে। বিদ্যাসাগরের সংস্কার-আন্দোলন যে এই ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল তা বললে অত্যুক্তি হবে না। সেই সঙ্গে রামগোপাল ঘোষের বাগ্মিতা, কৃষ্ণদাস ও হরিশচন্দ্রের লেখনী-পরিচালিত সংবাদপত্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর জাতীয়তাবোধক রচনা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে একটি আশ্চর্য প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। রামমোহন তো তাঁর জীবিতকালেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য নির্ভীকভাবে সংগ্রাম ক'রে এদেশে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ প্রশস্ত ক'রে গিয়েছিলেন। তিনিই জাতির প্রকৃত জনক।

তারপর কংগ্রেসের যুগ। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগের প্রসার। মিস্টার হিউম, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজী, স্যর ফিরোজশাহ মেহতা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ দিক্‌পালগণ এই যুগের প্রবর্তক। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতবাসী প্রাদেশিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। সর্বভারতীয় চেতনা তখনও জাগেনি অথবা বিরাট ভারতভূমিকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করবার মনোভাব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চিন্তায় স্থান পায়নি। পঞ্জাবের সঙ্গে বাঙ্গলা, বোম্বাইয়ের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ এবং সিন্ধুদেশের সঙ্গে আসাম তখনও একজাতিত্বের

বন্ধনে সংযুক্ত হয়নি। তখনও পর্যন্ত খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে একজাতিত্বের সূত্রে বাঁধবার প্রয়োজনীয়তা কারও কল্পনায় জাগেনি। তখন প্রত্যেক প্রদেশ নিজের নিজের সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত ছিল। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারতবাসী প্রাদেশিকতার গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সমগ্র ভারতকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করতে শিখলেন ও প্রাদেশিক সমস্যাগুলিকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে মনে করতে থাকেন। জাতির ঐতিহাসিক বিকাশ-ধারায় এটা অনিবার্য ছিল। ভারতবাসী একটি জাতিতে পরিণত হ'ল।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এই যুগের প্রবর্তক। রামমোহন যেমন জাতির জনক, সুরেন্দ্রনাথ তেমনি জাতীয়তার জনক। তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা সমগ্র জাতির প্রাণে দেশাত্মবোধ সঞ্চার করেছিল। শাসনকার্যের উচ্চপদে ভারতীয়গণের নিয়োগ. ব্রিটিশ ও ভারতীয় প্রজার অধিকারসাম্য, স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ-বৈষম্য-বিলোপ প্রভৃতি যুগপ্রবর্তকগণের কাম্যবস্তু ছিল। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহায্যে ন্যায্য অধিকার লাভ এবং অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারে সাফল্যলাভ—এই বিশ্বাসে তাঁরা স্থির ছিলেন, এর অধিক পদক্ষেপ করার কথা তাঁদের চিন্তায় তখন আসেনি। স্বামী বিবেকানন্দ এই যুগেরই একজন যুগনায়ক। তাঁর স্বজাতির পারমার্থিক উন্নতিবিধানে তিনি যতখানি না আগ্রহী ছিলেন জাতির ঐহিক উন্নতিবিধানে তার বেশি আগ্রহ তিনি প্রদর্শন করেছিলেন। দেশবাসীকে একটি সবল, প্রাণবান ও কর্মিষ্ঠ জাতিতে পরিণত করার জন্য তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছিলেন। জন্মভূমিকেই তিনি উপাসনার বিষয় ক'রে তুলে দেশের যুবকদের মধ্যে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ভারতের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রভাব অসামান্য। স্বজাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠ করাই তাঁর জীবনের ব্রতস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতারা কিন্তু দেশকে ঈপ্সিত নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হননি। তাঁরা ছিলেন ইংরেজী ভাবাপন্ন, ইংরেজী আদর্শে পরিচালিত অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহিত, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, লোকমত-নিরপেক্ষ, নিজের মতকে জনমত-রূপে প্রচার করার প্রয়াসী, জাতির নিম্নস্তরের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, স্বদেশের প্রতিষ্ঠা-সাধনে চিন্তাহীন আর নেতৃত্বের উচ্চভূমি পরিত্যাগ ক'রে জনতার সামিল হতে অনিচ্ছুক। এইজন্য এই যুগের নেতারা এত অল্পকালের মধ্যে নেতৃত্ব হারিয়েছিলেন।

এরপর তৃতীয় ধারার কথা। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নতুন দলের উদ্ভব হতে থাকে। তাঁরা আবেদন-নিবেদন ও আইনানুগ আন্দোলনে আস্থাবান ছিলেন না। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এই দলের প্রথম ও প্রধান বক্তা। তাঁরই কণ্ঠে ভারতবাসী প্রথম শুনল: **Swaraj is my birthright**—স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার। তিলক মনে করেছিলেন, ভারতবাসীকে স্বাধীনতা বা স্বরাজ অর্জন করতে হ'লে ভারতের জনগণকে স্বরাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি দুইটি উপায় অবলম্বন করেন। প্রথমত মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে গণপৎ-মেলার পুনরুজ্জীবন, দ্বিতীয়ত, শিবাজী-উৎসবের প্রবর্তন। গণপৎ-মেলায় হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হ'ত। সেই সকল মেলায় স্বদেশী গান ও রাজনৈতিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হ'ত। শিবাজী-উৎসবে সমগ্র মারাঠা জাতি যোগদান ক'রে ছত্রপতির স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠত। ধীরে ধীরে এই দুইটি উপায়ে মহারাষ্ট্র দেশে দেখা দেয় জীবনপ্রভাত। ধীরে ধীরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, বিশেষ ক'রে বাঙ্গলার যুবকগণ এই দুটি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

বাঙ্গলায় কয়েকটি বিশেষ কারণে একটি নতুন ভাবধারার প্রসার ও একটি নব্যসম্প্রদায় গঠনের সূত্রপাত হতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী ও পত্রাবলীতে বাঙ্গালী তরুণ একটা নতুন আদর্শের ও প্রেরণার মূর্তরূপ দর্শন করল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত তাদের দেশপ্রেমের উন্মাদনায় উদ্দাম ক'রে তুলল। বিপিনচন্দ্রের 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বাঙ্গালী যুবকদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে থাকে। সে এক বিচিত্র জীবনপ্রভাত এসেছিল বাঙ্গালীর জীবনে। সকলের উপর কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ফলে ও ফুলারী শাসন-নীতির দোষে বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে একটা প্রবল চরমপন্থী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিপিনচন্দ্র পাল এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অরবিন্দের কণ্ঠে ভারতবাসী যখন শুনল—'**We want absolute autonomy free from British control**'—তখনই ভারতের চিরাচরিত রাজনৈতিক চিন্তাধারায় একটা বড় রকমের দিক্-পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখন নবীন যুবক যখন এই দেশের রাজনীতিতে এই নতুন সুর শোনা গিয়েছিল। পঞ্চনদের তীরে তীরেও এর প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। পঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায় ছিলেন এই নব্য ভাবধারার পরিচালক।

নরমপন্থীদের কর্মপন্থায় এই নতুন দলের কোনরকম আস্থা ছিল না। আবেদন-

নিবেদনে অথবা বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণে এঁরা বিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছিলেন। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। রাজনৈতিক চেতনার এই যে দিক্-পরিবর্তন, জাতীয়তার এই যে নব-উদ্ভাসন এর সবটাই কিন্তু বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বা তার প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই ঘটেছিল তা মনে করলে ভুল হবে। বহুবিধ কার্যকারণের তরঙ্গাভিঘাতে ইতিহাসের গর্ভ স্পন্দিত হয় এবং সেই স্পন্দনের ক্ষেত্র ব্যাপক হয়ে থাকে। বিগত শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্ন থেকে এই শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে কালপরিধি (১৮৯৯-১৯০৫), সেই কালের মধ্যে সংঘটিত একাধিক ঘটনার প্রভাব শুধু ভারতবর্ষের উপরে নয়, সমগ্র এশিয়ার উপরেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই ঘটনাবলীর মধ্যে ১৯০৩-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধ ছিল একটি। প্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় তখনকার সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া যেদিন সূর্যোদয়ের দেশ ক্ষুদ্র জাপানের শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করল, সেদিন তার প্রতিক্রিয়াটা অনিবার্যভাবেই সমস্ত এশিয়া মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জাপানের এই অপ্রত্যাশিত বিজয়লাভ সেদিন শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীর ক্ষমতার প্রতীক ব'লে গণ্য হয়েছিল এবং এর ফলেই এই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল। এশিয়ার এই ব্যাপক মানসিক জাগরণকে অভিনন্দিত ক'রে ভারতবন্ধু এণ্ড্রুজ (ইনি তখন এই দেশেই অবস্থান করছিলেন) লিখেছিলেন:

'At the close of the year 1904 it was clear to those who were watching the political horizon that great changes were impending in the East. Storm clouds had been gathering thick and fast. The air was full of electricity. The war between Russia and Japan had kept the surrounding people on the tiptoe of expectation. A stir of excitement passed over the North of India. There has been nothing like it since the Mutiny.'[১]

পূর্বভারতে এই 'stir' বা স্পন্দন ছিল বাঙ্গলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলন। প্রবল পরাক্রান্ত একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাপানের মতো একটি ক্ষুদ্রশক্তির এই জয়লাভ সেদিন যে পরোক্ষভাবে এই স্বদেশী আন্দোলনকে প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং কার্জনী বিধান ছাড়াও বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের

১। *The Renaissance in India :* C. F. Andrews

পিছনে, এশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব যে অনেকখানি কার্যকর হয়েছিল তার সাক্ষ্য দিয়েছেন লর্ড মিণ্টো আর অ্যানি বেসান্ট। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে দক্ষযজ্ঞের পর নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলে গুরুতর মতভেদ ঘটে। এরপর দীর্ঘ দশ বছর চরমপন্থীদল কংগ্রেসে যোগদান করেননি। বাঙলাদেশে তখন যোগ্য নেতা ছিলেন না।

এবার ভারতের রাজনীতিতে পালাবদলের পালা আসন্ন হয়ে এল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ—'বাংলার কথা'—দেশের রাজনীতির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। সেই স্মরণীয় অধিবেশনে অসংখ্য শ্রোতাদের মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন একজন। তিনি তখনও সরকারী কলেজের অধ্যাপক। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় তাঁর তরুণচিত্তে স্বদেশপ্রেমের যে রঙ ধরেছিল, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের প্রাণস্পর্শী ভাষণ শুনে সেই রঙ যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছিল। এর ঠিক চার বছর পরেই তাঁর মনের আকাশে সেই রঙ কেমন ক'রে ইন্দ্রধনুর মতো ফুটে উঠেছিল সেই কাহিনী আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করব। চিত্তরঞ্জনের 'বাংলার কথা' থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি :

'একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখন সময় এসেছে। এসময় আর অপেক্ষা করলে চলবে না। প্রভুত্ব-প্রয়াসী আমলাতন্ত্রের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, এখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে ভারতবাসীর অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণের হাতে তা অর্পণ করতে হবে। এদেশে দীর্ঘকাল ধ'রে আমরা আমলাতন্ত্রের প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের পরাকাষ্ঠা দেখেছি—আমরা আর তা দেখতে চাই না। দেড়শো বছরের কুশাসনে আমরা জর্জরিত হয়েছি। আর একদিনও বিলম্বের প্রয়োজন নেই। সকল বিষয়ে আমরা দায়িত্বপূর্ণ শাসনক্ষমতা চাই। এটা আমাদের পেতেই হবে এবং যতক্ষণ দেশের জনসাধারণের হাতে দেশের শাসনভার দেওয়া না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা কোনমতেই নিরস্ত হব না, সন্তুষ্ট হব না।'

চিত্তরঞ্জনের এই বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ভাষণের প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই কংগ্রেসের পালাবদলের সুরটা শোনা গিয়েছিল। এইভাবে সেদিন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে, সেই ক্রান্তিলগ্নে আমরা পুরাতন কংগ্রেসের মৃত্যু ও নতুন কংগ্রেসের জন্ম প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তারপর ঘটনার স্রোত দ্রুত আবর্তিত হয়ে চলল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিমলা শৈলশিখরে স্বাক্ষরিত হ'ল মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট ; এর একমাস পরেই বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। নরমপন্থীরা এই কংগ্রেস বর্জন করেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হ'ল নতুন 'ভারতশাসন আইন আর সেই আইন কার্যকর হ'ল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট যে সময়ে প্রকাশিত হয় প্রায় ঠিক সেই সময়ে প্রকাশিত হয় রাউলাট কমিটির রিপোর্ট। এই রিপোর্ট দুটি পাশাপাশি রেখে ভারতবাসী বুঝতে পারল যে, 'The contrast between the Montague-Chelmsford proposals and the Rowlatt Bill was the contrast between the shadow and the reality'.[১]

এই রাউলাট কমিটির রিপোর্টকে উপলক্ষ করেই ভারতের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এই রিপোর্ট পাঠ ক'রেই তো তিনি বলেছিলেন: Something must be done to vindicate our self-respect.' তাঁর পরিকল্পিত এই 'একটা কিছু করতে হবে'—এর থেকেই সেদিন জন্ম নিয়েছিল সত্যাগ্রহ সংগ্রাম। বোম্বাইয়ের বিশেষ কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব সমর্থন ক'রে গান্ধীজী যা বলেছিলেন আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বলেছিলেন: 'This Report is unjust, subversive of all the principles of liberty and justice and destructive of the elementary rights of the individual.' বিক্ষুব্ধ ভারত যেন কটিবাসপরিহিত কৃশতনু এই মানুষটির মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ ঘোষণা করল। সে ঘোষণায় সরকার চমকিত হলেন।

রাউলাট বিল আইনে পরিণত হ'ল। দমনমূলক এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়া থেকেই ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল কি ধরনের স্বায়ত্তশাসন তারা নতুন ভারতশাসন আইনে পেতে চলেছে। একদিকে এই দমনমূলক আইন, অন্যদিকে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার, প্রধানত এই দুটিকে কেন্দ্র ক'রেই ধূমায়িত হতে থাকে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও অসন্তোষের আগুন। সবাই বুঝল এবার একটা বিস্ফোরণ আসন্ন। সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণেই ভারতের রাজনীতিতে ঘটেছিল গান্ধীজীর অভ্যুদয়। তারপর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, পঞ্জাবের অমৃতসরে ডায়ারী হত্যাকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নাইট খেতাব বর্জন—এইসব ঘটনা একের পর এক দ্রুতগতিতে ঘটে গিয়ে ভারতবাসীকে উপনীত ক'রে দিয়েছিল অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের রাজপথে। অনেক দেশপ্রেমিকের সঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্রও সেই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন।

১। *The Empire of the Nabobs :* Hutchinson

এইবারে আমাদের কাহিনীতে ফিরে আসি।

'১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমার বয়স ছিল ছত্রিশ। পনর বছর আমি বাঙ্গলার কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর সরকারী কলেজে ও দুটি বেসরকারী কলেজে শিক্ষকতা করেছি। কিন্তু আমার হৃদয় ও মনের যেটি মূল প্রবণতা—ইংরেজের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করা—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের সময় যার প্রথম বিকাশ—সেই ভাবটা কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি ; বরং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সমসাময়িক ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা, আর সরকারী শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির শ্বেতাঙ্গ-প্রধানদের সঙ্গে এবং শিক্ষাবিভাগের প্রভুদের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতির সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয়, আমার সেই প্রবণতাকে পরিম্লান করা দূরে থাক, উত্তরোত্তর তীক্ষ্ণ ক'রে তুলেছিল।'

আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি, দেশপ্রেমের যে আহিতাগ্নি কুড়ি বছর বয়সের সময় তিনি তাঁর অন্তরে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, তাকে নির্বাপিত হতে দেননি। তখন থেকে সরকারী কর্মে ইস্তফা দেওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি যেসব ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সেই আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, নতুন শাসন-সংস্কার, ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ—এইসব ঘটনা সংযুক্তভাবে তাঁর অন্তরে অবিভক্ত দেশপ্রেমের আহিতাগ্নিকে ক্রমবর্ধমান ক'রে তুলেছিল। ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী, বিশেষ ক'রে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলের মধ্যে বিবাদ ও সেই বিবাদের ফলে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামীদের চূড়ান্ত জয়লাভ —তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গেই পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি শুধু সময়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন যখন তিনি জাতীয়তাবাদী সংগ্রামীদের পাশে দাঁড়াবেন। অর্থাৎ তাঁর মন প্রস্তুত ছিল, সংকল্প স্থির হয়ে গিয়েছিল, শুধু একটা সংকেতের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। নাগপুর কংগ্রেস তাঁর কাছে সেই সঙ্কেতই বহন ক'রে এনেছিল। বস্তুত ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যখন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গান্ধীজীর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল ও যখন তিনি চম্পারণে প্রথম সত্যাগ্রহের বিষাণ বাজিয়েছিলেন তখনই নৃপেন্দ্রচন্দ্র দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময় তাঁর পুরাতন বন্ধু রাজেন্দ্রপ্রসাদ চম্পারণ সত্যাগ্রহে যোগদান করেছেন। চিত্তের সেই অস্থিরতা প্রশমিত রেখে আরও তিনটি বছর তিনি অপেক্ষায় থাকলেন।

অবশেষে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেসে যোগদান করতে এসে গান্ধীজীকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন ক'রে এবং তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ ক'রে নৃপেন্দ্রচন্দ্র চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম থেকে তিনি এসেছিলেন একজন দর্শক হিসাবেই। এখানে এসে তিনি চিত্তরঞ্জন ও বাঙ্গলার আরও কয়েকজন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'সরকারী কলেজের একজন অধ্যাপককে দেখে তাঁরা সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন—বিস্মিত হয়েছিলেন আমাকে প্রকাশ্যে এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে যাতায়াত করতে দেখে ও কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে একজন দর্শক হিসাবে যোগদান করতে। কিন্তু তাঁদের কেহই তখন ধারণা করতে পারেন নি যে দেশের কাজে ঝাঁপ দেবার সিদ্ধান্তটা আমার অনেক আগেই নেওয়া হয়ে গেছে—আমি শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।' জাতীয় কংগ্রেসের সেই স্মরণীয় নাগপুর অধিবেশন—সেখানে তিনি গান্ধীজীকে দেখে ও তাঁর মুখের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন—তাঁর কাছে সেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগটা এনে দিয়েছিল।

কংগ্রেসের এই নাগপুর অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীযুগের আরম্ভ এইখানেই, কারণ এই অধিবেশনেই তাঁর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়ে ভারতের জনজীবনে এক নতুন চেতনার সঞ্চার ক'রে দিয়েছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশের নিদ্রিত জনশক্তিকে। প্রকাশ্য অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একটি সরকারী কলেজের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। অসহযোগের প্রস্তাবটাই ছিল মুখ্য প্রস্তাব। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং বক্তৃতা-মঞ্চে উঠে সেই প্রস্তাবের সমর্থনে যখন জলদ-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করেন, নৃপেন্দ্রচন্দ্র সেই বক্তৃতা বিশেষ মনোযোগ সহকারেই শুনেছিলেন যেমন তিনি শুনেছিলেন তিন বছর আগে ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তাঁর সেই চিত্তস্পর্শী ভাষণ। প্রস্তাবটি সমর্থন করে চিত্তরঞ্জন যখন বললেন: 'I call upon you in the name of all that is holy to carry this resolution with no single dissentient note. Declare to the world that you realise your God-given right to be free—rights exist but they have got to be realised.'—তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্রের অন্তরে যে কি রকম উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। দেশমাতৃকার বেদীমূলে চিত্তরঞ্জনের আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তটা তাঁকে যে গভীরভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিল সে কথা তিনি অকপটেই বলেছেন তাঁর আত্মচরিতে।

'আমরা এক বছরের মধ্যেই স্বরাজলাভ করব'—গান্ধীজীর এই দৃপ্ত ঘোষণার পর নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। নৃপেন্দ্রচন্দ্র আরও অনেক কিছু জিনিস নাগপুর কংগ্রেসে প্রত্যক্ষ ক'রে অভিভূত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর ঐ প্রতিশ্রুতির মধ্যে তিনি অনুধাবন করলেন মুক্তি-সংগ্রামের পথে ভারতের নতুন পদক্ষেপ। প্রত্যক্ষ করলেন, এতদিনকার নরমপন্থী-প্রভাবিত জাতীয় মহাসভা ভিতরে ও বাইরে একটা নতুন রূপ ধারণ করেছে ; কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র নতুন ক'রে রচিত হল ; তাতে এর আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয় : 'The object of the Indian National Congress is the attainment of Swaraj by the people of India by all legitimate and peaceful means.' শুধু তাই নয়। যে প্রতিষ্ঠানটি এতকাল ছিল শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের একটি বিতর্কসভা অথবা বাৎসরিক বৈঠক, তা-ই এখন থেকে হয়ে দাঁড়াল একটি সুগঠিত সংগ্রামী রাজনৈতিক দল যার শিকড় গণচিত্ত পর্যন্ত প্রসারিত হ'ল। য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত প্রতিনিধিদের বদলে খদ্দর-পরিহিত মানুষদের এই অধিবেশনেই প্রথম দেখা গিয়েছিল। এই রূপান্তরের সব কৃতিত্ব ছিল কটিবাসপরিহিত একটি মানুষের—যিনি নিজেকে দরিদ্র ভারতবাসী, বুভুক্ষু ভারতবাসী, কৃষক ও মজুর ভারতবাসীর সগোত্র জ্ঞান করতেন। তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। চিত্তরঞ্জন এঁকে দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন আর নৃপেন্দ্রচন্দ্র আকৃষ্ট হয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনকে দেখে। তাঁর জীবনে নাগপুর কংগ্রেসের এটাই ছিল প্রাপ্ত-ফল। ভারতবর্ষ এসে দাঁড়াল একটা পরিবর্তনের মুখে। আকাশে-বাতাসে নতুনের আহ্বান ! ব্যক্তির ও জাতির জীবনে মাঝে মাঝে এমন আহ্বান এসে থাকে। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসে দর্শক হিসাবে যোগদান করতে গিয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কি সেই আহ্বান শুনেছিলেন ?

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে এইগুলি ছিল যথা—১. সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকরি ত্যাগ করা ; ২. সরকারী দরবার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান না করা ; ৩. সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনা ; ৪. আদালত বর্জন করা অর্থাৎ আইনব্যবসায় থেকে বিরত থাকা ও ৫. ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন বর্জন করা। তবে তিনটি বিষয়ের উপরে বেশী জোর দেওয়া হয়—আদালত, ব্যবস্থাপক সভা ও স্কুল-কলেজ বর্জন। এই ত্রিধা বর্জন-ভিত্তিতে সেদিন গান্ধীজী সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে এই আন্দোলনকে ব্যাপক এবং সফল ক'রে তুলবেন—এই ছিল তাঁর মনের আশা। এই কর্মসূচী নৃপেন্দ্রচন্দ্রের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল। নিজেই তিনি বলেছেন যে, যদিও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বৈপ্লবিক ভাবধারায় তাঁর মন

অভিষিক্ত ছিল, তথাপি তাঁর প্রকৃতি ও শিক্ষা তাঁকে সোজা পথে এবং প্রকাশ্য উপায়ে দেশের কাজ করতে প্রেরণা দিত। এই আদর্শের প্রতি তাঁর পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি যেমন সুস্পষ্ট তেমনি দ্ব্যর্থহীন: 'I had no stomach for the secret methods of the revolutionary Bengal groups, though I know many of the leaders and they know me and my mind'. গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শ যখন চিত্তরঞ্জন সমর্থন ও গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না, তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র ঐ পথেই পদক্ষেপ করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন।

নাগপুর কংগ্রেসের কর্মসূচীতে আরও তিনটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল: এক কোটি স্বেচ্ছাসেবক, এক কোটি চরকা আর স্বরাজ-তহবিলের জন্য এক কোটি টাকা সংগ্রহ করা। এক বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ অর্জন ও খিলাফৎ অন্যায়ের প্রতিবিধান করার জন্য যে অহিংস সংগ্রাম করতে হবে, এই কর্মসূচী হবে তার হাতিয়ার। নাগপুর কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে চিত্তরঞ্জন তাঁর আইন-ব্যবসায় চিরদিনের মতো পরিত্যাগ করলেন। দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ ক'রে দিতে সর্বস্বপণে তিনি যখন পথের ধুলায় নামলেন তখন তাঁর সেই অভাবনীয় ত্যাগের দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা তথা ভারতের জনসাধারণের চিত্তে যে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল তার তাৎপর্য হৃদয়-মন দিয়ে অনুভব করতে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাই যে নাগপুর থেকে ফিরে এসে কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিতে তিনি আর দ্বিধা করলেন না। সেই কাহিনী এইবার বলি।

১৯২১, ১৪ মার্চ।

চট্টগ্রামের ইতিহাসে তথা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন চিত্তরঞ্জন চট্টগ্রামে উপনীত হলেন। তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অতিথি হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। ইনিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে ইনি অধ্যাপনায় জলাঞ্জলি দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ও তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। বয়ঃকনিষ্ঠ হ'লেও হেমন্তকুমার নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। কৃষ্ণনগরেই হেমন্তকুমারের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। ১৫ই মার্চ চট্টগ্রামের এক বিরাট জনসভায় চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করলেন। 'আমি সেই সভায় দূর থেকে একজন শ্রোতা ও দর্শক ছিলাম—কারণ তখনও পর্যন্ত

আমি একটি সরকারী কলেজের অধ্যাপক এবং চট্টগ্রাম কলেজের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিলাম। সভায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে যখন সভামঞ্চের নিকটে গিয়ে চিত্তরঞ্জনের কাছাকাছি দাঁড়াতে বললেন, তখন আমি সরলভাবেই তাঁকে বললাম যে, দাসত্বের নিদর্শন সঙ্গে ধারণ করে, স্বাধীনতার পুরোহিত দেশবন্ধুর সম্মুখে গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারি না।

'ঐদিন সন্ধ্যার সময়ে হেমন্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি তাঁকে পরের দিন আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলাম। পরদিন সকালে আমার বাড়ীতে এসে হেমন্ত প্রথমেই বললেন, দেশবন্ধু জানতে চেয়েছেন তাঁকে কেন নিমন্ত্রণ করা হয়নি। রুদ্ধকণ্ঠে আমি তাকে বললাম, আমার পক্ষে সম্মানের হলেও, তাঁর মতো ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করার যোগ্যতা আমার কোথায়? ১৬ই মার্চ সন্ধ্যায় সেনগুপ্তের ভবনে দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন হেমন্তকুমার। নিভৃতে তাঁর সঙ্গে আমার আধঘণ্টাকাল বাক্যালাপ হ'ল। দেশবন্ধুকে আমি বললাম, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য আমার মন প্রস্তুত, কিন্তু বিনা উপার্জনে (আমি তখন সাতশো টাকা ক'রে মাসে উপায় করতাম) আমার বৃহৎ পরিবার কিভাবে প্রতিপালিত হবে (তখন আমার বাড়ীতে অবস্থান ক'রে কলেজের পঁচিশজন দুঃস্থ ছাত্র পড়াশুনা করত)। উত্তরে দেশবন্ধু আমাকে বললেন, এমনই দুশ্চিন্তা তাঁরও হয়েছিল। কিন্তু কেউ যদি দেশের কাজে ঝাঁপ দিতে চায় তবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে এবং ফলাফল বিবেচনা না ক'রেই সেটা করতে হবে। তারপর আমি তাঁকে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলাম, যদি আমি এই উচ্চ সরকারী চাকরি ত্যাগ করি তাহলে আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে, পঞ্চাশ কি একশোজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী কি কংগ্রেসে যোগদান করবেন? দেশবন্ধু সরলভাবেই উত্তর করলেন, সেটা অনিশ্চিত। এতগুলি সরকারী কর্মচারীর পক্ষে পদত্যাগ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। আমার দৃষ্টান্ত দ্বারা একশো লোক হয়ত অনুপ্রাণিত হতে পারে; অন্যদিকে এটাও সম্ভব যে একটি বালকও আমার পদাঙ্কের অনুসরণ করবে না। আমি যদি আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত হয়ে থাকি, যদি আমার দেশপ্রেম আন্তরিক হয়, তাহলে কোন কিছু প্রত্যাশা না করেই এগিয়ে আসতে হবে।'

দেশবন্ধুর এই অকপট উত্তরই সেদিন নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মনকে প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছিল। শুনেছি, ঐ স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের সময়ে তিনি আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কি আশ্বাস দিতে পারেন

যে, আমরা সত্যিই এক বছরের মধ্যে স্বরাজলাভ করব? কঠিন প্রশ্ন সন্দেহ নেই। বৃথা আশ্বাস দিয়ে লোককে দেশের কাজে অনুপ্রাণিত করার মতো মানুষ ছিলেন না দেশবন্ধু। তাই নৃপেন্দ্রচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, না, তেমন কোন আশ্বাসই আপনাকে দিতে পারি না। এটা নির্ভর করছে আমাদের এই আন্দোলনের ফলাফল আর এর কর্মসূচির সম্পূর্ণ রূপায়ণের ওপর। তাঁর মুখে এমন অকপট উক্তি শুনে, দেশবন্ধুর নেতৃত্বের উপর নৃপেন্দ্রচন্দ্রের শ্রদ্ধা কি রকম বৃদ্ধি পেয়েছিল সেই কথা বলতে গিয়ে তাঁর আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন: **'I was a big 'catch' for the movement and any other might have attempted to hook me anyhow; not so Deshabandhu, the soul of truth and honour!'**

আধঘণ্টার সাক্ষাৎকার শেষ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা ধ'রে চলেছিল এবং দেশবন্ধুর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা ক'রে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন মধ্যরাত্রি। তিনি যে চাকরিতে ইস্তফা দিতে চলেছেন, এই কথাটা তাঁর সহধর্মিনীকে পর্যন্ত জানাবার সাহস তাঁর হয়নি, যদিও নাগপুর কংগ্রেস থেকে ফিরে আসা অবধি তিনি তাঁর পরিজনবর্গকে এর আভাস দিয়েছিলেন। 'পরের দিন অধ্যক্ষকে সম্বোধন করে শেষ রাতে লেখা ছোট্ট একটি ইস্তফা পত্র কলেজে পাঠিয়ে দিলাম এবং সেটি সরাসরি সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। ঐ পত্রে আমি সোজাসুজি বলেছিলাম যে প্রচলিত সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় আমার আর আস্থা নেই এবং একটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পদ্ধতি তৈরী করার উদ্দেশ্যেই আমি ইস্তফা দিলাম। আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করার সময় নেই এবং সেইজন্য নিয়মমাফিক নোটিশ দেওয়া সম্ভব হ'ল না।'

১৭ই মার্চ সকালবেলায় সেই পত্রটি হাতে নিয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র এলেন সেনগুপ্তের ভবনে। দেশবন্ধুকে দেখালেন সেটি। দেশবন্ধু রীতিমত বিস্মিত হলেন এবং তাঁকে এই ব'লে সাবধান করলেন যে, নোটিশ না দেওয়ার জন্য সরকার হয়ত তাঁকে কর্মচ্যুত করতে পারেন। এর উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তা তাঁর মতো একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকেরই উপযুক্ত: 'কর্মচ্যুতি অথবা ইস্তফা কিছুই আমি এখন আর গ্রাহ্য করি না—আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি—কাজেই সরকারের বিরাগভাজন হওয়াতে আমার কোন ভয় নেই।'

এমনই নির্ভীকতার সঙ্গেই আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র সেদিন দেশের কাজে ঝাঁপ দিয়ে, তাঁর তরুণ বয়সের সঙ্কল্পসাধনের জন্য নতুন পথের পথিক হলেন। ১৭ই মার্চ,

১৯২১, নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনে আরম্ভ হ'ল একটি নতুন অধ্যায়—এতদিন যিনি শিক্ষকতা ক'রে এসেছেন আজ থেকে তিনি হলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী ও কংগ্রেসের সেবক। কোন মানুষের জীবনে এমন রূপান্তর সহসা আসে না—অন্তরে স্বদেশপ্রেমের ভাব না জাগলে ত্যাগ ও দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথে সহসা কেউ পদক্ষেপ করতে পারে না। যে আহিতাগ্নি এতকাল তিনি সকলের অগোচরে নিজের অন্তরে সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন তাই আজ তাঁর ললাটে গৌরবের জয়তিলক এঁকে দিল। মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধুর আহ্বানে সরকারী কর্মে ইস্তফা দিয়ে সেদিন শিক্ষক নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন দেশের মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিবেদন করেছিলেন তখন তাঁর অন্তরের বীণায় এই সঙ্গীতই বেজে উঠেছিল :

'তব আহ্বান আসিবে যখন
সেকথা কেমনে করিব গোপন,
সকল বাক্য সকল কর্ম প্রকাশিবে তব আরাধনা।'

রাজনৈতিক আবর্তে নৃপেন্দ্রচন্দ্র

দ্বিতীয় পর্ব

সরকারী কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কংগ্রেসের খাতায় নাম লেখালেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ব্যবহারিক জীবনের দৃষ্টি থেকে দেখলে বলা যায় যে এই সময়ে তিনি যেন অকূলে তরী ভাসালেন। বহু জনের নির্ভরস্থল যিনি ছিলেন সেই রকম একজন অধ্যাপকের পক্ষে এটা বড় কম ত্যাগের পরিচায়ক ছিল না। চট্টগ্রাম কলেজে তিনি তখন সহকারী অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কর্মত্যাগ না করলে হয়ত উত্তরকালে নৃপেন্দ্রচন্দ্র অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হতে পারতেন। কিন্তু ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি দেশসেবার কণ্টকাকীর্ণ পথে নির্ভীকচিত্তেই পদক্ষেপ করলেন। প্রাণ যখন জাগে তখন এমন ক'রেই জাগে, হিসাব ক'রে জাগে না। দেশবন্ধুর জীবনটাই ত' এর একটি বড়ো দৃষ্টান্ত। মাত্র এই একটি দৃষ্টান্ত সেদিন বাঙ্গলা দেশে দেশপ্রেমের যে জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল তার কোন তুলনা নেই।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের দৃষ্টান্তটিও তেমনি সমগ্র চট্টগ্রামে সেদিন এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে তাঁর পদত্যাগ

এবং কংগ্রেসের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। কেবলমাত্র একটি জেলার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকে নি, সমগ্র প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তিনি নিজেই এই প্রসঙ্গে বলেছেন: '১৯২১ সালেই আমার পরিচয়টা সারা বাংলাদেশেই যেন ছড়িয়ে পড়েছিল; চট্টগ্রাম ও আশপাশের জেলাগুলির উপর, বিশেষ ক'রে ছাত্রসমাজে আমার পদত্যাগের দরুন মনস্তাত্ত্বিক ফলাফলটা খুবই প্রচণ্ড হয়েছিল এবং সমগ্র চট্টগ্রাম ডিভিশনে স্কুল-কলেজ বর্জন করা একপ্রকার সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল এবং স্বল্পদিনের মধ্যেই কয়েকশত কলেজছাত্র ও কয়েক হাজার স্কুলছাত্র যোগদান করার ফলে আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে উঠেছিল।'

নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন তখন চিত্তরঞ্জনের কথায় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তিন মাসের জন্য তাঁর আইন ব্যবসা বন্ধ রেখেছিলেন। তখন প্রথমেই সেনগুপ্তকে নিয়ে গঠিত হয় একটি জেলা কংগ্রেস কমিটি; তিনি প্রেসিডেন্ট আর নৃপেন্দ্রচন্দ্র ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তাঁদের সঙ্গে একে একে এসে যোগদান করলেন মহিমচন্দ্র দাস, প্রসন্নকুমার সেন, ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী, শেখ কাসেম আলি মিঞা প্রভৃতি চট্টগ্রামের কয়েকজন সুসন্তান। জেলা কংগ্রেস কমিটির বহুবিধ কার্যসূচির মধ্যে একটি ছিল মুষ্টিভিক্ষা। এই বিভাগটির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ভবিষ্যতের বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেনের ওপর। ইনি তখন একজন বি. এ. পাশ-করা জাতীয়তাবাদী স্কুলশিক্ষক ছিলেন এবং তখন থেকেই ইনি ছাত্রমহলে 'মাস্টারদা' এই নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। মুষ্টিভিক্ষায় সংগৃহীত চাল বিক্রী ক'রে জেলা কংগ্রেস কমিটির তহবিলে মাসে সাত শ' টাকা ক'রে জমা হ'ত। এটা বড়ো কম কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না। নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন যে মুষ্টিভিক্ষা বিভাগে যে পঞ্চাশ ষাটটি ছেলে কাজ করত তাদের মধ্যে তাঁর নিজের দুটি ছেলে ও একজন ভাইও ছিল। স্থানীয় তরুণ ব্যবহারজীবী, স্কুল মাস্টার ও হিন্দু-মুসলমান বহু বয়স্ক ছাত্র কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন; এঁদের মধ্যে 'পাঞ্চজন্য' সম্পাদক অম্বিকাচরণ দাস, শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সত্যপ্রসন্ন সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বরদাপ্রসাদ নন্দী, শৈলেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। এইভাবে দেশপ্রিয় ও নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটি সেদিন সমগ্র জেলায় এক অভূতপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। 'আমরা তখন গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ ক'রে লোকদের মনে উৎসাহ জাগাতাম ও তাদের কংগ্রেসের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করতাম। তখন থেকেই শুরু হয় স্বরাজ তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহ আর প্রচারিত হতে থাকে অহিংস উপায়ে বিপ্লব। এর ফলে চট্টগ্রাম শীঘ্রই বাঙ্গলায় অসহযোগ আন্দোলনের

একটি ঝটিকা-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল, যেমন হয়ে উঠেছিল বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুর।'

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী যে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রতিধ্বনি সারা ভারতেই সেদিন শোনা গিয়েছিল। আর আবেদন-নিবেদন নয়, একেবারে সংগ্রাম—অহিংস সংগ্রামের পথে দেশবাসীকে এনে তিনি যেন দাঁড় করিয়ে দিলেন। বিক্ষুব্ধ দেশবাসী গান্ধীজীর আহ্বানে যেন মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভকে শিথিল ক'রে দেবার উপক্রম করেছিল। ছেলেরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজের জন্য কংগ্রেসের পতাকাতলে ভীড় জমিয়েছে, তাদের দেশসেবার সঙ্গে যাতে শিক্ষার যোগ থাকে সেজন্য কংগ্রেসের নির্দেশে জেলায় জেলায় জেলা কংগ্রেসের পরিচালনায় একটি ক'রে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চট্টগ্রামে নৃপেন্দ্রচন্দ্র অগ্রণী হয়ে স্থাপন করেছিলেন অনুরূপ একটি বিদ্যালয়; এটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত সারস্বত আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত হ'ত।

কংগ্রেসে যোগদান করার পর যে স্মরণীয় সম্মেলনে তিনি যোগদান করেছিলেন সেটি ছিল বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পঞ্চাশ হাজার লোক এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বর্ষীয়ান জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত আর বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন সভাপতি। বস্তুত অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর বঙ্গদেশে এটাই ছিল প্রসিদ্ধ ঘটনা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বরিশালেই অনুরূপ যে সম্মেলনটি হয়েছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতিপটে তা অম্লান ছিল। '১৯০৫ সালের বরিশালই আমাকে দেশপ্রেমের প্রথম দীক্ষা দিয়েছিল এবং পনর বছর পরে আমি সেই বরিশালের ভূমি আবার স্পর্শ করলাম, তবে এবার আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে।'—নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজে এই কথা লিখেছেন। চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, অখিল দত্ত, শাসমল প্রভৃতি অনেকেই এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই সম্মেলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং বঙ্গদেশের স্কুলকলেজগুলি জাতীয়করণ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি তিনিই উত্থাপন করেছিলেন ও সেই প্রস্তাবটি সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন হয়, তাতে তিনি পৌরোহিত্য করেন। বরিশালের অন্যতম সুসন্তান বাগ্মী ও দেশপ্রেমিক শরৎকুমার ঘোষ এই সম্মেলনে একটি উদ্দীপনাময়ী ভাষণ প্রদান করেছিলেন।

কিন্তু যে কারণে এ সম্মেলন বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে সেটি হ'ল বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা। এই প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে মন্তব্য

করেছেন : ' The President was Bepin Chandra Pal whose address was an intellectual treat but not in support of the Congress campaign and the methodology accepted by the country under Gandhiji's lead.' কিন্তু তিনি বিশদভাবে আলোচনা বা বিচার করেন নি, কেন বিপিনচন্দ্র অসহযোগের বিরোধিতা করেছিলেন। সেদিন তাঁর এই ভাষণ উপলক্ষ ক'রে তিনি কংগ্রেসী দলে অপাঙক্তেয় হয়ে গিয়েছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন যে শুধু নেতিমূলক অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারাই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। স্বরাজের কাঠামো সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক আর একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা কার্যসূচি প্রণয়ন করা দরকার। আরও বলেছিলেন, এই অসহযোগিতার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ করা। কিন্তু এ আপোষে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে যে ক্রান্তদর্শী বিপিনচন্দ্র ঠিক কথাই বলেছিলেন। কিন্তু বললে কি হবে, সেটা ছিল ভোজবাজির যুগ—এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভের যুগ, তাই বিপিনচন্দ্রের লজিক বা কঠিন যুক্তি গান্ধীবাদীদের কাছে মনঃপূত না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

বরিশাল থেকে নৃপেন্দ্রচন্দ্র সোজাসুজি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন নি। প্রায় একমাস কাল যাবৎ ফরিদপুর ও ঢাকা জিলার গুরুত্বপূর্ণ বহু স্থানে তিনি অসহযোগের সমর্থনে প্রচারকার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর এই প্রচারকার্যের সঙ্গী ছিলেন প্রসন্নকুমার সেন ও তাঁর কয়েকজন অনুরক্ত ছাত্র। 'মাস্টার মশাই বক্তৃতা করতে আসছেন'—এই সংবাদ যখন যেখানে ছড়িয়ে যেত তখনই সেখানে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বক্তৃতা শুনবার জন্য হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটত। প্রত্যেকটি সভায় তাঁর বক্তৃতা ও প্রসন্নকুমারের গান শ্রোতাদের মধ্যে অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করত। প্রধানত নৃপেন্দ্রচন্দ্রের চেষ্টায় চট্টগ্রাম জেলা থেকে কংগ্রেসের জন্য একলক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা ও তিলক স্বরাজ তহবিলের জন্য একলক্ষ টাকা চাঁদা তোলা সম্ভব হয়েছিল এবং চরকার প্রচারও নিতান্ত মন্দ হয় নি।

বার্মা অয়েল কোম্পানীর একটি শাখা ছিল চট্টগ্রামে। আগাগোড়া শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত এই বিলাতী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় শাখার সঙ্গেই স্থানীয় কংগ্রেসের প্রথম সংঘর্ষ বেধেছিল এবং সেই সংঘর্ষে কংগ্রেস পক্ষেরই বিপুল জয়লাভ ঘটেছিল। কয়েক শত বাঙ্গালী কর্মচারী এখানে কাজ করত আর শ্রমিকদের

সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কোম্পানীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অভিযোগের অন্ত ছিল না। তখন চট্টগ্রামে কংগ্রেসের উদ্যোগে নীচের তলার মেহনতী মানুষদের নিয়ে একাধিক সমিতি গঠিত হয়েছিল। বার্মা অয়েল কোম্পানীর স্থানীয় শাখার শ্রমিকরাও সংঘবদ্ধ হতে চাইল। তারা এসে কংগ্রেসের নেতাদের অনুরোধ জানাল। এই অনুরোধের পরিণতি 'বার্মা অয়েল লেবার ইউনিয়ন'। এই সমিতি গঠনে উক্ত কোম্পানীর একজন পদস্থ কর্মচারী, বিনোদবিহারী চক্রবর্তী অনেকখানি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। 'অমনি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা সমুচিত জবাব দিলাম ধর্মঘট সংগঠন ক'রে। এই ধর্মঘটের দাবী ছিল দুটি—বিনোদবাবুর পুনর্বহাল আর শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি। অয়েল কোম্পানীর স্থানীয় ম্যানেজার আস্ফালন ক'রে বলেছিলেন যে তাঁরা বরং গান্ধীজীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন কিন্তু অধ্যাপক ব্যানার্জীর সঙ্গে বোঝাপড়া করা কিংবা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব। তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম যে চট্টগ্রাম থেকে গান্ধীজী আছেন বহুদূরে, যদি বোঝাপড়া করতে হয় তবে সেনগুপ্ত এবং আমার সঙ্গেই সেটা করতে হবে।' যতীন্দ্রমোহন ছিলেন এই ইউনিয়নের সভাপতি। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারকে নতি স্বীকার ক'রে ধর্মঘট মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। এই জয়লাভ সেদিন জনসাধারণের চক্ষে চট্টগ্রামে কংগ্রেসের মর্যাদাকে অনেকখানি বৃদ্ধি ক'রে দিয়েছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে পনর দিন ব্যাপী এই ধর্মঘটের ফলে সেদিন চট্টগ্রাম বন্দরে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

দেখতে দেখতে স্বরাজ আন্দোলনের গতি সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে—কয়লাখনির কুলী, চা-বাগানের কুলী, রেলের শ্রমিক, এদের মধ্যেও গান্ধীজীর অসহযোগ বার্তা সেদিন যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল তা আজ, এই সুদূরকালের ব্যবধানে আমরা কল্পনা করতে পারব না। আসামের সংরক্ষিত চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে এই সময়ে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তারই পরিণতি হ'ল চাঁদপুরের ঘটনা ও আসাম বেঙ্গল রেলশ্রমিক ধর্মঘট যা সেদিন সর্বভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই দুটি ধর্মঘট পরিচালনার ব্যাপারে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে একত্রে নৃপেন্দ্রচন্দ্রও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। চা-বাগানের কুলী ধর্মঘটের ইতিহাসটা সংক্ষেপে ছিল এই রকম।

আসামের চা-বাগানের কুলীরা যেন ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করত।

কী দুর্বিষহ ছিল তাদের জীবন, সব রকম অত্যাচার আর লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করতে হ'ত। তাদের আর কুলী রমণীদের ওপর বাগানের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কী জঘন্য নিগ্রহ করত বাইরের লোকদের তা জানবার উপায় ছিল না। কারণ বাইরের লোকের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। কুলীদের বেতন ছিল যৎসামান্য দেনায় তাদের মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যেত। তাই চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও বাগান থেকে কুলীদের ফিরে আসা অসম্ভব ছিল। মোট কথা আসাম করিমগঞ্জ ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের চা-বাগানের হাজার হাজার কুলী মনুষ্যত্ব বঞ্চিত হয়ে পশুর অপেক্ষাও হেয় জীবন যাপন করত।[১]

এই ভয়াবহ নিষিদ্ধ অঞ্চলে ক্রীতদাসের তুল্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষগুলির মধ্যে কংগ্রেস-কর্মীরা যখন অসহযোগের বার্তা পৌঁছে দিল তখন তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল এক নতুন জীবনের স্পন্দন। ভারতের দিকে দিকে তখন দেখা দিয়েছিল জনজাগরণ। অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা খরবেগে ছুটে চলেছে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। একদিন শোনা গেল, করিমগঞ্জ ও শ্রীহট্টের চা-বাগানের কুলীরা দলে দলে পায়ে হেঁটে চাঁদপুর স্টেশনে এসে হাজির হয়েছে। তারা দেশে ফিরে যাবে, সেখানে গিয়ে যা হয় কিছু করবে, না হয় না খেয়ে মরবে, তবু তারা বাগানের শ্বেতাঙ্গ মালিকদের ক্রীতদাস হয়ে আর থাকবে না। চাঁদপুর থেকে তারা দেশে ফিরে যাবে এই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তখন চা-বাগানের ইংরেজ মালিকরা একযোগে আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করল তাঁরা যেন কিছুতেই কুলীদের টিকিট না দেন। ফলে চাঁদপুর রেল স্টেশনের উন্মুক্ত স্থানে হাজার হাজার কুলী অবস্থান করতে থাকে। রেলপথ, জলপথ সবই বন্ধ, সর্বত্র পুলিশের কঠোর পাহারা। অনাবৃত স্টেশন-প্রাঙ্গণে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে কুলীরা দিনের পর দিন অবস্থান করতে লাগল।

মিস্টার কিরণ চন্দ্র দে তখন চট্টগ্রামের ডিভিশনাল কমিশনার। তিনি ছিলেন একজন পুরোদস্তুর 'ব্রাউন বুরোক্র্যাট'। চাঁদপুরের সাবডিভিশনাল অফিসারটিও ছিলেন একজন সিভিলিয়ান। এঁরা দুজনে মিলে গুর্খা পুলিশের সাহায্যে সেদিন চাঁদপুর রেলস্টেশনে যে নৃশংস ঘটনার অবতারণা করেছিলেন তার সংবাদ যখন চট্টগ্রামে পৌঁছল তখন জেলা কংগ্রেসের সকল দায়িত্ব অর্পিত ছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ওপর। 'আমি তৎক্ষণাৎ এই মর্মে হুকুম জারি করলাম যে এক পক্ষ কালের জন্য

১। 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবরণ হতে অতি সাম্প্রতিক কালে সঙ্কলিত 'Slavery in British Dominion' গ্রন্থে চা-বাগানের কুলীদের মর্মন্তুদ চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

জেলার সমস্ত আদালত বর্জন করা হবে—আইন বলতে আর কি-ই বা আছে যখন কমিশনার স্বয়ং এই রকম বে-আইনী কাজ করছেন। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ ঢোল সহরতে সেই সংবাদ সহরে জানিয়ে দিয়েছিল; তারা স্থানীয় উকিলদের সঙ্গেও ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন করেছিল। স্থলপথে ও জলপথে সহরের মধ্যে প্রবেশ করবার পথগুলি আমাদের স্বেচ্ছাসেবক-প্রহরীরা নিয়ন্ত্রণ করেছিল; ফলে মামলাকারী কোন লোকই সহরে আসতে পারেনি; আদালতে যাবার পথগুলিও ঐভাবে পাহারা দেওয়া হয়েছিল। এক সপ্তাহকাল কোর্ট বসেছিল, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এমনি প্রাধান্য ছিল আমাদের আর এমনি শক্তিশালী ছিল কংগ্রেসের সংগঠন যে, ব্রহ্মদেশ থেকে আগত চিঠিপত্র পর্যন্ত সেদিন বিলি করা সম্ভব হয়নি।' চট্টগ্রামে সেদিন কংগ্রেসের শক্তি ও মর্যাদাবৃদ্ধি স্থানীয় শাসকদের—বাঙ্গালী কমিশনার ও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট—মনে বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার করলেও তাঁরা স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন নি। নেতা বলতে তখন দুজনের নাম সকলের মুখে মুখে ফিরত—ব্যারিস্টার বাবু ও মাস্টারবাবু। যতীন্দ্র-মোহন ও নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জনপ্রিয়তার দরুন তাঁরা সমগ্র চট্টগ্রাম জেলার জনসাধারণের কাছে ঐ নামে সেদিন অভিহিত হয়েছিলেন।

চাঁদপুর থেকে যতীন্দ্রমোহন ফিরে আসার পর উভয় নেতার মধ্যে আলোচনার ফলে আদালত বর্জন নোটিশ একসপ্তাহকাল পরে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই যতীন্দ্রমোহন ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র দুজনে স্থানীয় বিশিষ্ট রেল-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই আলোচনারই ফল ছিল আসাম বেঙ্গল রেল শ্রমিক সমিতি; সেনগুপ্ত ছিলেন এর সভাপতি আর নৃপেন্দ্রচন্দ্র পরামর্শদাতা। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই সমিতিটি সেদিন সংগঠিত হয়েছিল। 'সমিতি গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সমগ্র আসাম বেঙ্গল রেলপথে বিদ্যুৎগতিতে ধর্মঘটের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র দেশে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে সরকারের সমগ্র শাসনযন্ত্রকে পঙ্গু ক'রে দেওয়া। কিন্তু পরে আমরা দেখেছিলাম যে অন্যান্য প্রদেশ প্রস্তুত ছিল না এবং আমাদের সেনাপতি, গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত ঠিক বিপ্লবের ধারায় চিন্তা করছিলেন না। প্রধানত চাঁদপুর রেল-স্টেশনে কুলীদের ওপর অত্যাচার আর দ্বিতীয়ত বেতন, ছুটি প্রভৃতি বিষয়ে দাবীর সমর্থনে ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে সেনগুপ্ত এই ধর্মঘটের নির্দেশ দিয়েছিলেন। একটি ছোট্ট কাগজের ওপরে লেখা ও তাঁর স্বাক্ষরিত এই নির্দেশ আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সকল কেন্দ্রের সকল স্তরের ভারতীয় কর্মচারীদের দেখান হয়েছিল এবং

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে এই রেলপথের সকল শ্রেণীর ভারতীয় কর্মচারী ধর্মঘটে যোগদান করেছিলেন। সমগ্র রেলপথ অচল হয়ে গিয়েছিল এই ধর্মঘটের ফলে।'

বস্তুত অন্য ধর্মঘটীদের প্রতি নির্যাতনের সহানুভূতিতে ভারতবর্ষে সেই প্রথম ধর্মঘট আর জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে অমন বৃহৎ ও ব্যাপক ধর্মঘটও ভারতবর্ষে সেই প্রথম। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের এই আচমকা ধর্মঘটের প্রভাব সেদিন ষ্টীমার কোম্পানীর কর্মচারীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে চাঁদপুর, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ ও গোয়ালন্দের মধ্যে ষ্টীমার চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কুমিল্লার জননায়ক বসন্তকুমার মজুমদারের চেষ্টাতেই এই ষ্টীমার ধর্মঘট সম্ভব হয়েছিল। চাঁদপুরে চা-বাগানের কুলীদের ধর্মঘট, চট্টগ্রামে রেল-কর্মচারীদের ধর্মঘট ও ষ্টীমার-কর্মচারীদের ধর্মঘট—দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় যুগপৎ সংগঠিত এই তিনটি ধর্মঘটের গুরুত্ব সেদিন বড় কম ছিল না। স্বয়ং দেশবন্ধু ও দীনবন্ধু এনড্রুজকে এজন্য চাঁদপুরে আসতে হয়েছিল। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী ধর্মঘটে যোগদান করেছিল। একথা বললে কিছু মাত্র অত্যুক্তি বা অনৈতিহাসিক হবে না যে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অভ্যুদয়ে জাতির জীবনে যে জোয়ার এসেছিল তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন আমরা যেন লক্ষ্য করেছিলাম উনিশ শ' একুশ সালের এই ব্যাপক রেল-শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে। সমকালীন বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই ধর্মঘটের ফলে একটিও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে নি; পঁচিশ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রবভাবে সংগঠিত হওয়া বড় কম কথা ছিল না।

এই ঐতিহাসিক ধর্মঘটের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। তিনমাস ব্যাপী এই ধর্মঘটের সময় একদিন চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যখন সহরে সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ক'রে ১৪৪ ধারা জারি করেন তখন সহরে একটি বিরাট জনসভা হয় এবং আদেশের প্রতিবাদে সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয়। সভায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও অন্যান্য নেতারা সেই নোটিশ ছিঁড়ে ফেলেন। চট্টগ্রামের এই সংগ্রামকে অভিনন্দিত ক'রে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাঁর 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকায় 'জয়তু চট্টগ্রাম' বলে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার কংগ্রেসী মহল যখন চট্টগ্রামের ব্যাপারে একরকম নিষ্ক্রিয় ছিলেন তখন শ্যামসুন্দরই চট্টলের নেতা ও কংগ্রেস-কর্মীদের এবং রেল ধর্মঘটীদের এই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকায় এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটির একাংশে অধ্যাপক

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ত্যাগের কথা ও কংগ্রেসের পতাকাতলে চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সংহত করার জন্য তাঁর প্রয়াসের কথা উল্লেখ ক'রে শ্যামসুন্দর এই মন্তব্যটি করেছিলেন: 'Prof. Banerji must be a mad man to burn his boat at the prime of his youth with a view to dedicating, rather sacrificing himself at the altar of the Congress. Brave, dutiful and honest, Nripendra Chandra has the makings of a leader in him. His courage and sincerity is of that order which no true patriot can do without.'

তখন অসহযোগের যুগ—অসহযোগের মুখপাত্র 'সার্ভ্যাণ্টের' অসাধারণ প্রতিষ্ঠা। সেই পত্রিকা থেকে এমন প্রশংসা লাভ বড় সামান্য কথা ছিল না। নৃপেন্দ্রচন্দ্র সেইদিন থেকে শ্যামসুন্দরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উত্তরকালে শ্যামসুন্দরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে তিনিও একজন নো-চেঞ্জার বা পরিবর্তনবিরোধী রয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মূল্যও দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে বার্মা অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক ধর্মঘটকে উপলক্ষ ক'রে 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকা অনুরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের মাধ্যমে যতীন্দ্রমোহনকেও অভিনন্দিত করেছিল। শ্যামসুন্দরের সেই সম্পাদকীয়টিই ('The Sweepers' king') পরোক্ষভাবে তরুণ অপেক্ষাকৃত অখ্যাত যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বলাভের পথ অনেকখানি প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন ও নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন তথা শান্তিপূর্ণ রেলধর্মঘট স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় যে দুটি নিবন্ধ লিখেছিলেন (Chittagong in the Fore' ও 'Chittagong speaks'), তার একটিতে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের উল্লেখ ছিল।

এইখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। ধর্মঘটের সময় যখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র জানতে পারলেন যে কোন কোন ধর্মঘটী উত্তেজনার বশে অনেকগুলি মালগাড়ীর ক্ষতিসাধন করেছে তখন তিনি সংগঠনমূলক কাজে তাদের নিয়োগ করার কথা চিন্তা করতে থাকেন। 'আমি তখন স্বল্পসংখ্যক গঠনকার্য-অভিলাষী, কয়েকজন কংগ্রেসী ও আমার কয়েকজন ছাত্র-কর্মীদের নিয়ে আলোচনা করলাম এবং চট্টগ্রাম সহরের মধ্যস্থলে গঠনমূলক কাজের একটি কেন্দ্র খুললাম। আমি তখন যে বাড়ীতে বাস করতাম সেইখানেই এই কেন্দ্রটি খোলা হয়। কয়েকটি তাঁত ও চরকা এবং কয়েকটি ছেলে নিয়ে একটি স্কুল—এই ছিল আমাদের সাংগঠনিক কাজের

সূচনা। আমি এই কেন্দ্রটির নাম দিয়েছিলাম 'সারস্বত আশ্রম'। আশ্রমে অর্থনীতি ও রাজনীতির কিছু বই নিয়ে একটি গ্রন্থাগারও খোলা হয়। আমার বন্ধু সেনগুপ্ত আমার এই উদ্যমে উৎসাহিত বোধ করলেন না। কিন্তু আমি আমার সঙ্কল্পে অটল রইলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, নেতিবাচক ও নাশকতামূলক কাজের পর কংগ্রেস-কর্মীদের গঠনমূলক কিছু কাজ অবশ্যই করতে হবে। আমার ধারণাই ঠিক ছিল—কারণ ১৯২১ সাল থেকে এই গঠনমূলক কাজের ওপর তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন।'

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশব্যাপী যে গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছিল তা চাক্ষুষ করবার জন্য মৌলানা মহম্মদ আলির সমভিব্যাহারে গান্ধীজী ভারতভ্রমণে বেরুলেন। এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঙ্গলা—দেশবন্ধুর বাঙ্গলা; কারণ তাঁর নেতৃত্বে এই প্রদেশেই সেদিন এই আন্দোলন সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কিছুকাল বাঙ্গলার নানাস্থান পরিভ্রমণ ক'রে গান্ধীজী এলেন আসামে। তাঁর এই আসাম ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। এখানে উল্লেখ্য যে মহাত্মা গান্ধীকে একবার চট্টগ্রাম পরিদর্শন করবার জন্য ও স্বচক্ষে রেল-ধর্মঘটের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য চট্টগ্রাম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ করার জন্যই জুলাই মাসে নৃপেন্দ্রচন্দ্র একবার কলিকাতায় এসেছিলেন। 'গান্ধীজী তখন ভবানীপুরে রূপচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে দেশবন্ধুর ভগিনী ঊর্মিলা দেবীর গৃহে অবস্থান করছিলেন। সেইখানেই আমি তাঁকে প্রথম দেখি।'

আসাম ভ্রমণ শেষ ক'রে গান্ধীজী এলেন চট্টগ্রামে। এখানে তিনি বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন এবং এখানে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও জাতির জনপ্রিয়তা দেখে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন। চট্টগ্রামে গান্ধীজী যে দু দিন অবস্থান করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম দিন একটি জনসভায় তিনি ভাষণ দেন; একলক্ষ দর্শক সেই সভায় সমবেত হয়েছিল। তাঁর উপস্থিতিতে কংগ্রেস-কর্মী ও ধর্মঘটীদের মধ্যে যে আলোচনা হয় তারই ফলে তিন মাস ব্যাপী রেল ধর্মঘটের অবসান হয়। সেদিন সেই ১৯২১ সালে যে সব সর্বত্যাগী ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক চট্টগ্রামকে অসহযোগ আন্দোলনের মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে সহায়তা করেছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁদেরই অন্যতম এবং অনেক বিষয়ে প্রধানতম ছিলেন ইতিহাস অভ্রান্তভাবেই সে সাক্ষ্য বহন করে।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কারাদণ্ড
বা
স্বরাজ আশ্রমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র

১৯২১, ৪ঠা অক্টোবর

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে একটি স্মরণীয় তারিখ।

ঐদিন ইংরেজের আদালত এই দেশপ্রেমিককে একবৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। এর পরেও তিনি আরও দুবার দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কারাদণ্ডের ইতিহাসটা এই রকম। সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সেই যে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন তখন থেকে দীর্ঘ ছয় মাস কাল নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন যাপন করতে হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন: 'নিরবচ্ছিন্ন কাজ, বিনিদ্র রজনী, রাত্রিতে তিন-চার ঘণ্টা ব্যতীত বিশ্রামহীন দিন, পদব্রজে অথবা নৌকাযোগে একটি কেন্দ্র থেকে অপর একটি কেন্দ্রে ভ্রমণ, প্রতিদিন সহস্র জনতার সামনে বক্তৃতা দেওয়া, কংগ্রেস-বিরোধী লোকদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়ে তাদের মত পরিবর্তন করা, গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস-কর্মীদের সাংগঠনিক কাজের যথাযথ নির্দেশ প্রদান—এই সব কাজ নিরলসভাবে করার ফলে আমার স্বাস্থ্যের অবনতি, চট্টগ্রামের এক বিশেষ ধরনের রোগে আমি আক্রান্ত হই এবং যকৃৎ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এমন শারীরিক অবসাদ ও দুর্বলতা বোধ করতে থাকি যে চিকিৎসকগণ আমাকে কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য উপদেশ দিলেন।'

এই রকম যখন তাঁর শরীরের অবস্থা তখন জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন নৃপেন্দ্রচন্দ্র ১০৮ ধারায় রাজদ্রোহ ও বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসাপ্রচারের অভিযোগে সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হলেন ও যথাসময়ে জামিনে মুক্তিলাভের নির্দেশসহ একটি ওয়ারেণ্ট তাঁর কাছে এসে হাজির হ'ল। দেশসেবার পুরস্কার এতদিনে মিলল। রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করার পর থেকে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তিনি চট্টগ্রামে যখন যেখানে বক্তৃতা করতেন তখনই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠতেন ডিভিশনাল কমিশনার কিরণচন্দ্র দে। বিশেষ ক'রে চাঁদপুরের ঘটনার পর থেকে নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রত্যেকটি জনসভায় তীব্রভাবে তাঁর কাজের সমালোচনা করতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন চট্টগ্রাম কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দেন

তখন উক্ত কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন কমিশনার দে। তিনি নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে সম্ভ্রমের চক্ষেই দেখতেন এবং চট্টগ্রাম কলেজের সুনাম যে তাঁর জন্য অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই ত' তিনি বার বার লোক পাঠিয়ে ইস্তফা প্রত্যাহার করার জন্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন। কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতার দ্বারা জনসভায় এইভাবে সমালোচিত ও আক্রান্ত হওয়ার দরুন অবশেষে সরকারী মর্যাদা রক্ষার জন্যই কমিশনারের নির্দেশে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বিরুদ্ধে ১০৮ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছিল।

২৩শে সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মামলার শুনানী আরম্ভ হ'ল। ম্যাজিস্ট্রেট একজন য়ুরোপীয় ছিলেন। বিচারের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মের মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যেটুকু অবকাশ পেতেন তা তিনি বিশ্রামসুখে যাপন করেন নি। ঐ সময়ে তিনি 'Ideals of Swaraj: in Education and Government', এই নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[১] এইটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার প্রথম ফল। বইটি লেখা শেষ হ'লে অসুস্থতার দরুন বায়ু পরিবর্তনের জন্য যখন তিনি কলিকাতায় আসেন তখন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন ও এক সপ্তাহকাল এখানে অবস্থান ক'রে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। 'সেই সময়ে', নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন, 'আমার বন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ বইটি সংশোধন করেন (এটি মাত্র পঁচাত্তর পৃষ্ঠার একটি পুস্তক ছিল) ও একটি দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন। তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে পাণ্ডুলিপি মাদ্রাসের বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান গণেশ অ্যাণ্ড কোম্পানীতে[২] পাঠিয়ে দেন। মুদ্রিত পুস্তকের একশত কপি আমার কারাদণ্ডের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে এসে পৌছল। আমার রাজনৈতিক ও শিক্ষা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার নিদর্শন হিসাবে এই গ্রন্থের একটি কপি আমি আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেছিলাম। তখন তাঁর দণ্ডদান শেষ হয়েছে।'

এই বিচার চলার সময়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র খুব অসুস্থ ছিলেন। সমকালীন বিবরণ থেকে আমরা অবগত হই যে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁকে পালকির আকারে

১। অনেক অনুসন্ধানের ফলে কলিকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের এই গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়। এজন্য উক্ত গ্রন্থাগারের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান শ্রী এম, এন, নাগরাজের নিকট লেখক কৃতজ্ঞ।

২। এই শতকের সূচনাকাল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের যে সব বিশিষ্ট নেতা লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের বক্তৃতা-জীবনী প্রকাশ ক'রে গণেশ অ্যাণ্ড কোম্পানী যে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান আমরা এই ভাবেই পেয়েছি। ভারতবর্ষে আর কোন পুস্তক প্রকাশন এই গৌরবের অধিকারী নন।

তৈরী পুষ্পসজ্জিত একটি ষ্ট্রেচারে বহন ক'রে আদালতে নিয়ে যেত ও 'বন্দে মাতরম্', 'কংগ্রেস কি জয়' ধ্বনি দিতে দিতে এজলাসে উপস্থিত হ'ত। বিচারের সময় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক কার্য এবং বক্তৃতা প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য একটি মুচলেকা দিতে বলেন, অন্যথা এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইবে। দেশোদ্ধারব্রতীর পক্ষে যা করা উচিত তিনি তাই করেছিলেন—কারাদণ্ডই গ্রহণ করেছিলেন হাসিমুখে। 'বিকেল বেলায় আদালত থেকে আমাকে স্থানীয় জেলে নিয়ে যাওয়া হয়; আমাকে অনুসরণ করে এক বিশাল জনতা ও পুলিশ রক্ষী দল। আমার বেশ মনে আছে, ঐ সময়ে শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট এক বৃদ্ধ মুসলমান এই ব'লে কেঁদেছিলেন, হায়, এমন লোকদেরও ইংরেজরা ধরে ধরে জেলে পুরছে। এই ঘটনাটি আমার স্মৃতিপটে আজও অম্লান আছে এইজন্য যে দেশের জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্রত্যাগ ও দুঃখবরণের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আমাদের মনে যথেষ্ট সান্ত্বনার সঞ্চার ক'রে দিয়েছিল। আর এই শ্রদ্ধা জানাল তারাই যাদের আমরা জনসাধারণ ব'লে অভিহিত ক'রে থাকি—অত্যাচারিত ও শোষিত কৃষক সম্প্রদায় যাদের জন্য আরম্ভ হয়েছে এই সংগ্রাম।'

চট্টগ্রামে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখন কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা-রূপেই গণ্য হয়েছিলেন। তথাপি তিনি জনসাধারণের কথা, দরিদ্র কৃষকদের কথা গভীরভাবে চিন্তা করতেন ও কংগ্রেসের সংগ্রাম যে প্রকৃতপক্ষে তাদেরই জন্য এটাও তিনি বিশ্বাস করতেন। আরাম কেদারাবিলাসী নেতাদের যুগ তখন শেষ হয়ে কংগ্রেসে এসে গিয়েছে এক অভিনব যুগ আর তারই একজন প্রতিনিধি স্থানীয় নেতা হিসাবে তিনি গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শের মধ্যে এটাই লক্ষ্য করেছিলেন যে গান্ধীজী জনতাকেই আহ্বান করেছেন, জনসাধারণকেই সংগ্রামের সামিল হতে বলেছেন। সেদিন কারাদণ্ড লাভের পর কারাগার অভিমুখে যাত্রা করবার সময় পথিমধ্যে ঐ বৃদ্ধ মুসলমানকে ঐভাবে ক্রন্দন করতে দেখে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মতো একজন দেশপ্রেমিকের পক্ষে, গান্ধীবাদী একজন দেশকর্মীর পক্ষে ঐভাবে অভিভূত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। সেদিন যতীন্দ্রমোহন ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রমুখদের নেতৃত্বই যে চট্টগ্রামবাসীর জীবনে নবজীবনের স্পন্দন এনে দিয়েছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদেরকে অহিংস-অসহযোগের বলিষ্ঠ আদর্শে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

২০শে অক্টোবর পুলিশ আইনের ৩২ ধারা ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারা অনুযায়ী যতীন্দ্রমোহনও অভিযুক্ত হয়ে তিন মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত

হলেন। চট্টগ্রামের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী ঐ সময়ে কারান্তরালে প্রেরিত হয়েছিলেন। গান্ধীজী মিথ্যা লেখেন নি—'চট্টগ্রাম সকলের পুরোভাগে' অথবা 'চট্টগ্রাম আজ সোচ্চার'। যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, সেদিন অসহযোগ আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনে কলিকাতার পরেই চট্টগ্রাম হয়ে উঠেছিল অসহযোগের প্রধান তীর্থস্থান। দেশবন্ধু যখন এখানে আসেন তখন থেকেই এখানে সঞ্চারিত হয়েছিল যে বিপুল প্রাণবন্যা—যার কথা নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় বিশদভাবেই বিবৃত করেছেন—তাই-ই আজ এই দুই নেতা ও তাঁদের বহু সহকর্মীর গ্রেপ্তারে যেন জলধির প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে পরিণত হ'ল। ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে আমরা বলতে পারি যে সেদিন একমাত্র মেদিনীপুর ব্যতীত বাঙ্গলার অপর কোন জিলা আন্দোলনের পুরোভাগে এমনভাবে দাঁড়াতে পারেনি যেমন দাঁড়িয়েছিল চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের ললাটে এই যে গৌরবতিলক অঙ্কিত হয়েছিল তার মূলে ছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ত্যাগ আর যতীন্দ্রমোহনের নির্ভীক নেতৃত্ব।

কারাদণ্ডের পর যখন চট্টগ্রামের দুই নেতা কারাগারে নীত হলেন তখন আর একটি সমস্যা দেখা দিল। সেই সমস্যা ছিল কারাগারের খাদ্য, পোশাক আর শয্যাদ্রব্য—এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে। এই প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজেই লিখেছেন : '১৯২১ সালে সাধারণ ভারতীয় কয়েদীদের যে প্রকার খাদ্য ও পরিচ্ছদ দেওয়া হ'ত তা কদর্য এবং নিম্নমানের। পোকায় খাওয়া ও ধুলো মেশানো মোটা চালের ভাত, তার সঙ্গে ডাল অথবা তরকারি—নামেই ডাল এবং নামেই তরকারি—এই ছিল কারাগারের কয়েদীদের খাদ্য। ডোরা কাটা একজোড়া জাঙ্গিয়া আর কুর্তা—এই ছিল কারাগারের পোশাক আর শয্যা বলতে দুখানা মোটা কম্বল। অবশ্য বিচারাধীন আসামী হিসেবে আমরা আমাদের বাড়ী থেকে পাঠানো খাদ্য, বস্ত্র ও বিছানা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু অভিযুক্ত হওয়ার পরে জেল-কোডের বিধান অনুসারে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্য রইল না—ঐ বিচিত্র খাদ্য, পোশাক ও শয্যা গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় ছিল না। আমরা সোজাসুজি কারাগারের খাদ্য ও পোশাক প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান খুবই ভদ্রলোক ছিলেন; আমাদের মতো কয়েদীদের জন্য জেল-কোডে বিশেষ কোন বিধান আছে কিনা তা তিনি বাঙ্গালী জেলারের সহায়তায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু এ অনুসন্ধান নিষ্ফল ছিল,

কারণ তখনো পর্যন্ত জেল-কোড বা আইনে 'রাজনৈতিক বন্দী' ব'লে কোনও প্রকার বন্দীর উল্লেখ ছিল না ; কয়েদীদের মাত্র দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হ'ত—য়ুরোপীয় ও ভারতীয় এবং এখানেই একটা বড় রকমের পার্থক্য ছিল। য়ুরোপীয় কয়েদীদের খাদ্য যেমন উৎকৃষ্ট, পরিচ্ছদও তেমনি ভদ্র। আর বিছানা হিসাবে তারা পেত কম্বল, চাদর ও বালিশ এবং প্রয়োজন হ'লে এগুলি তারা বদলাতে পারত। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান আমাকে য়ুরোপীয় কয়েদী হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হতে অনুরোধ করলেন ; বললেন, মিস্টার সেনগুপ্ত ঐ শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। এই প্রস্তাবে আমি জ্বলে উঠলাম —মনেপ্রাণে একজন ভারতীয় হয়ে আমি কিনা নিজেকে য়ুরোপীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য করব ! প্রস্তাবটা আমার কাছে অসম্মানজনক মনে হ'ল। সুপারিন-টেনডেণ্ট সুবিবেচক ছিলেন, তিনি আমাদের সকল রকম ভাবেই বিচারাধীন কয়েদীর মতোই থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।'

দণ্ডিত হওয়ার এক সপ্তাহকালের মধ্যেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে কলিকাতায় আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে এসে কারাগারের সঙ্গী হিসাবে তিনি পেলেন ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফরিদপুরের পীর বাদশা মিঞাকে। ঐ সময়ে বাঙ্গলার কয়েকজন দণ্ডিত বিপ্লবীদের আন্দামান থেকে বাঙ্গলায় ফিরিয়ে এনে আলিপুর জেলের একটি বিশেষ ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কংগ্রেসীদের চক্ষে তিনি তখন মডারেট ব'লে উপহসিত হতেন, কিন্তু দেশপ্রেমে তিনি যে কারো চেয়ে কম ছিলেন না, এই সত্যটা কিছুতেই অস্বীকার করবার নয়। অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন মিস্টার অ্যাশ তখন আলিপুর জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা করতেন ইনি তখন ঐখানে সিভিল সার্জন ছিলেন। সুপারিনটেনডেণ্ট যখন নবাগত এই রাজবন্দীর পরিচয় জানতে পারলেন তিনি তখনই তাঁর হাসপাতালে থাকার সকল ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কারাগারের মধ্যে হাসপাতালই একটি মাত্র স্থান যেখানে খাওয়াদাওয়া অপেক্ষাকৃত ভাল এবং থাকার দিক থেকেও অনেক সুবিধাজনক। 'জেল হাসপাতালে যাওয়ার পরেই আমার সহবন্দীদের সংবাদ পাঠালাম যে তাঁরা যেন অবিলম্বে অসুস্থতার অজুহাতে হাসপাতালে চলে আসেন। ডাক্তার ব্যানার্জীসহ প্রায় দশজন রাজবন্দী তখন হাসপাতাল ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত হন এবং এর ফলে আলিপুর জেলে আমাদের দিনগুলি বেশ ভালভাবেই কাটতে থাকে। ডাক্তার সুরেশ ব্যানার্জী এখানে রোগীদের তত্ত্বাবধান করতেন ও অনেক সময়ে রোগ নির্ণয়ে জেলের

ডাক্তারদের সহায়তা করতেন আর আমি প্রতিটি শয্যা ঘুরে ঘুরে রোগীদের সান্ত্বনা দিতাম, তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতাম।'

দেখতে দেখতে দু মাস কেটে গেল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আলিপুর জেল রাজনৈতিক বন্দীদের সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ ক'রে কারাগারে হঠাৎ এই রাজবন্দীর সমাগম সেটি এখানে উল্লেখ্য। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯২১ সালটিকে সত্যিই একটি বিক্ষোভ ও সংঘাতপূর্ণ বছর ব'লে অভিহিত করা চলে। বছরের শেষভাগে ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-পরিদর্শন উপলক্ষে সেই সংঘাত উঠল চরমে। কিন্তু এ ছাড়া এই সময়ে মোপলা (মালবারের মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়) বিদ্রোহের ফলে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় তা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে ব্যাহত করে এবং কংগ্রেসী ও খিলাফতীদের মধ্যে নিয়ে আসে একটা বিচ্ছেদের ভাব। এই অপ্রীতিকর পটভূমিকায় যুবরাজ আসেন ভারতে নভেম্বর মাসে। বোম্বাই আর কলিকাতা—এই সহর দুটি তখন নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনায় রীতিমত বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল। বাঙ্গলার কথাই বলি। দেশবন্ধুর আহ্বানে সারা বাঙ্গলা দেশে দু লক্ষ লোক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করেছিল। সরকার থেকে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী ঘোষিত করা হয়। আসলে এটা ছিল দেশবন্ধুর প্রতি সরকারের স্পর্ধাপূর্ণ আহ্বান। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত হ'ল—সরকারের এই আদেশ অবৈধ। আগের মতোই কংগ্রেসের কর্মসূচি অনুসারে চলতে থাকে সহরের মহল্লায় মহল্লায় খদ্দর ফেরি ও ধর্না দেওয়া। শুরু হয় দেশের সর্বত্র অভূতপূর্ব গ্রেপ্তারের পালা। দেশবন্ধুর আহ্বানে বাঙ্গলার তরুণ সেদিন যেভাবে সাড়া দিয়েছিল তা আজ ইতিহাস হয়েছে।

নভেম্বরের মাঝামাঝি যুবরাজ যখন ভারতবর্ষে পৌঁছলেন তখন সমগ্র দেশ সংঘর্ষ ও উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। যুবরাজের আগমন তাতে ইন্ধন জোগাল। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হওয়ার দরুন ত্রিশ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল—আন্দোলনের পুরোভাগে যে সব নেতা ছিলেন তাঁরাও বাদ যান নি। একমাত্র গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত কারাগারের বাইরে ছিলেন। নভেম্বরের শেষভাগ থেকেই তাঁর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে আরম্ভ হয় আইন অমান্য আন্দোলন। নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দু মাস ভারতবর্ষে এই আইন অমান্য আন্দোলন চরমে উঠেছিল। গান্ধীজী ছিলেন এই আন্দোলনের সর্বভারতীয় ডিক্টেটর বা অধিনায়ক। বাঙ্গলায় দেশবন্ধু; তিনিই সেই সময়ে প্রদেশ কংগ্রেসের

প্রথম ডিক্টেটর নিযুক্ত হয়েছিলেন। কলিকাতায় যুবরাজের আগমন আসন্ন। ভারতবর্ষে পদার্পণ করা অবধি তাঁর ভাগ্যে প্রত্যাশিত অভ্যর্থনা কোথাও জোটে নি। বাঙ্গলার লাট রোনাল্ডশে তাই হরতাল বন্ধ রাখার জন্য দেশবন্ধুকে অনুরোধ করলেন, কারণ এই প্রদেশের রাজনৈতিক জীবন তখন তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হচ্ছিল। দেশবন্ধু সম্মত হলেন না।

১০ই ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে যাবার আগে দেশবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়ে যান যাতে যুবরাজের আগমন উপলক্ষে বয়কটের আয়োজন ঠিকমতো হয়। দেশবন্ধুর মামলা চলবার সময়েই যুবরাজ কলিকাতায় এলেন ২৪শে ডিসেম্বর। সেদিন শহরে যে হরতাল হয়েছিল একটি বিদেশী সংবাদপত্র তাকে 'remarkably successful' ব'লে অভিহিত করেছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে. যুবরাজের আগমনের দিন 'সমস্ত শহর নীরব, নিস্তব্ধ, সমস্ত পথঘাট জনমানবশূন্য, শ্মশান—লোক নাই, জন নাই, গাড়ী নাই, ঘোড়া নাই'। সেদিন সত্যই একদিনের জন্য দেশবন্ধুর ইঙ্গিতে মহানগরীর প্রাণস্পন্দন থেমে গিয়েছিল এবং তা প্রত্যক্ষ ক'রে শত্রুমিত্র সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। মহানগরীতে এই ঐতিহাসিক বয়কট আন্দোলনের সাফল্যের পিছনে অবশ্য ছিল তরুণ সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক প্রয়াস। বিচারে দেশবন্ধুর ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। তখন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন; দেশবন্ধু তাঁকেই প্রদেশ কংগ্রেসের অধিনায়ক ক'রে যান।

আলিপুর কারাগারে তখন জমজমাট অবস্থা—ছোটবড় সব. নেতাই তখন সাময়িকভাবে সরকারের এই অতিথিশালায় একত্রে অবস্থান করেছিলেন। প্রত্যেকটি জেলার কারাগারগুলির ঐ একই অবস্থা হয়েছিল—রাজনৈতিক বন্দীতে ভরে গিয়েছিল সব কারাগার। এক চট্টগ্রামেই ছয় শত লোক আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ক'রে কারাবরণ করেছিল। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ প্রভৃতি মিলিয়ে আলিপুর কারাগারে তখন পাঁচশ রাজনৈতিক বন্দীর সমাবেশ ঘটেছিল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন: 'দুপুর থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি কারাগারের একটি বিশেষ ওয়ার্ডে—বোমার ওয়ার্ডে সময় যাপন করতাম। বাঙ্গালী বিপ্লবীদের ঐ ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে আমার এক প্রাক্তন ছাত্রকে আবিষ্কার করেছিলাম—আশুতোষ লাহিড়ী—রাজশাহী কলেজের স্নাতক। এই বিপ্লবীরা সকলেই আন্দামানের সেলুলার জেল থেকে এখানে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।' আলিপুর কারাগারে তিনি যে সব নেতাদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী,

দেশবন্ধু, মৌলানা আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, কিরণশঙ্কর, সুভাষচন্দ্র ও বীরেন্দ্র শাসমল প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। কারাগারে দেশবন্ধুর পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেছিলেন কিরণশঙ্কর ও সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধুর পরেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র যে মানুষটির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। সেই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে রেগুলেশন আইনে ধৃত ও নির্বাসিত নয়জনের মধ্যে শ্যামসুন্দর ছিলেন একজন। তাঁর 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকা তখন সারা ভারতে সংবাদপত্র জগতে এনে দিয়েছে যুগান্তর। শ্যামসুন্দরও দেশসেবক নৃপেন্দ্রচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তাঁর ত্যাগ, বিশেষ ক'রে ইংরেজিতে তাঁর দখলের জন্য। কারাগার থেকেই তিনি নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে ছয় মাসের জন্য 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করেন। শ্যামসুন্দরের এই মহানুভবতা তাঁকে যারপরনাই মুগ্ধ করেছিল।

প্রথমবার কারাবাসের সময় তিনি 'ভারতের বাণী ও যুগবার্তা' ব'লে একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তক রচনা করেন; স্ত্রীশক্তির প্রশস্তিও তাতে ছিল। বইটির শেষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকে উদ্ধৃতি ছিল। স্ত্রীকে বইটি উৎসর্গ করেছিলেন। 'সরস্বতী প্রেস' প্রকাশক ছিলেন।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নৃপেন্দ্রচন্দ্র

এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন বাইরে এলেন তখন অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেছে—কংগ্রেসের রাজনীতিতে ঘটেছে দিক্‌-পরিবর্তন। এমন অবস্থায় কারাগারে থাকতেই শ্যামসুন্দর যখন তাঁকে 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসাবে নির্বাচন করেন তখন তিনি ভুল করেন নি। যোগ্য লোকের হাতেই তিনি তাঁর পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি এই 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকাতেই এবং এই প্রথম পর্যায়ের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী সাংবাদিক জীবনে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল।

শ্যামসুন্দরের প্রতিষ্ঠিত 'দি সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকা সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এই মন্তব্যটি করেছিলেন, 'The most dynamic of Non-co-operation dailies in India'। তাঁর কারামুক্তির পর অসহযোগ আন্দোলনের এই শক্তিশালী দৈনিকের প্রধান সম্পাদকপদে নিযুক্ত হওয়া

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সরকারী কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান ক'রে একজন নির্ভীক দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি যেমন দেশবাসীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন এবং সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকপদে বৃত হওয়ার পর তিনি সাংবাদিক জগতে ঠিক তেমন ভাবেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন এবং একজন প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকরূপে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি শ্যামসুন্দরের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই ছয়মাসকাল নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন।

প্রসঙ্গত শ্যামসুন্দর ও তাঁর 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (১৮৬৯-১৯৩২) মনেপ্রাণে একজন খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। তাঁর অনুরাগী সতীর্থদের মধ্যে তিনি 'স্বদেশী শ্যামসুন্দর' ব'লে পরিচিত ছিলেন। এই নির্লোভ ব্রাহ্মণ ছিলেন যেন ত্যাগের প্রতিমূর্তি আর দেশপ্রেমের একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। এই শতাব্দীর সূচনায় স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য ক'রে দেশজননী যখন তাঁর সন্তানদের ডাক দিয়েছিলেন তখন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, সংসারচিন্তা দূরে রেখে তরুণ শ্যামসুন্দর অনেকের সঙ্গে সে আহ্বান শুনেছিলেন এবং মনেপ্রাণে তাতে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের গৌরব লাভ না করলেও একজন জাতীয়তাবাদী নেতা, সুদক্ষ সাংবাদিক ও বাগ্মী হিসাবে তাঁর খ্যাতি সারা দেশেই পবিব্যাপ্ত হয়েছিল। সেকালের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, তিলক, মালব্য ও মুঞ্জে থেকে আরম্ভ ক'রে একালের বিপিনচন্দ্র, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষ প্রভৃতি সকলেই তাঁর স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতা, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অন্যদিকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অটুট নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য তাঁকে সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় ক'রে তুলেছিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র হিসাবে শ্যামসুন্দর গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। গায়ত্রী মন্ত্র জপ না ক'রে জল স্পর্শ করতেন না, অথচ জীবনাচরণে তিনি কোনও দিনই গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতার পরিচয় দেন নি। দেশপ্রেমিক মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে তিনিই ত' অগ্রণী ছিলেন। হিন্দু-সংস্কৃতির মধ্যে আবাল্য লালিতপালিত ও বর্ধিত এবং নিজে হিন্দুভাবাপন্ন হ'লেও তাঁর মধ্যে তথাকথিত হিন্দুয়ানি অথবা সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না।

এই গুণেই ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ শ্যামসুন্দরকে গভীর-ভাবে শ্রদ্ধা করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দুর আচারব্যবহার অক্ষুণ্ণ রেখেও এই ব্রাহ্মণ কেমন ক'রে যে সার্বজনীনতার স্তরে পৌছতে পেরেছিলেন তাঁর সম্পর্কে সেইটাই হ'ল সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা। সেকালের ও একালের বহু নেতার জীবনে চরিত্রগত শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু শ্যামসুন্দর ছিলেন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ—নির্লোভ ও নিষ্কলঙ্ক যার দৃষ্টান্ত বাঙ্গলার দুই যুগের রাজনীতিতে খুব বেশি দেখা যায় নি। নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই কারণেই এই মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন ঠিক ঐ প্রকৃতির একজন দেশপ্রেমিক।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন শ্যামসুন্দর, কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর জীবনে কোনও দিন অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে নি, বরং তা হয়ে উঠেছিল পরম শ্লাঘার বিষয়। সেই দারিদ্র্য দুর্ভেদ্য বর্মের মতো তাঁকে সর্বদা ঘিরে থাকত এবং সেই বর্মে ঠেকে অন্যের অনুগ্রহ প্রতিহত হয়ে ফিরে যেত। সহজ সরল ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন শ্যামসুন্দর—ঋষিতুল্য বললেই হয়। যৌবনে রাজনীতি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল সত্য, কিন্তু রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে তিনি কোনদিনই আত্মহারা হন নি। এমন কি, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দেশবন্ধুর কারাদণ্ডের পর তিনি যখন বাঙ্গলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক বা ডিক্টেটরের পদে আসীন হয়েছিলেন তখনও নেতৃত্বগর্বে এই ব্রাহ্মণকে কেউ আত্মহারা হতে দেখে নি। তেমনই যশোহরে প্রাদেশিক সম্মেলনের তিনি যখন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তখনও তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের মোহ জাগেনি। তার কারণ এই মানুষটি মনেপ্রাণে ছিলেন একজন খাঁটি দেশসেবক। জাতীয়তাবাদ তাঁর কাছে শুধু কথার কথা ছিল না, ছিল বিশ্বাসের সামিল। এক্ষেত্রে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও অরবিন্দ ঘোষের সগোত্র ছিলেন শ্যামসুন্দর। তাই ত' গান্ধীজীর মতো নেতাকে তার সম্পর্কে বলতে শুনি: 'I can never forget Shyamsunder's transparent sincerity'। স্বদেশী যুগ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত বাঙ্গলায় দলমতনির্বিশেষে এমন অজাতশত্রু ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা বোধ হয় আর একজনও ছিলেন না। নৃপেন্দ্রচন্দ্রও ঠিক এই শ্রেণীর দেশসেবক ছিলেন।

রাজবিদ্রোহী শ্যামসুন্দরকে বাঙ্গালী প্রথম জেনেছিল সেই স্বদেশীযুগে জাতীয়তা-বাদী ও চরমপন্থীদের অন্যতম নেতা হিসাবে। অনুশীলন সমিতির সূচনাকাল থেকেই তিনি এর কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তখন থেকেই তাঁর কণ্ঠে স্বদেশপ্রেমের দীপকরাগিণী ঝঙ্কৃত হ'ত। আর তখন থেকেই ব্রিটিশ

রাজ-শক্তির শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল তাঁর ওপর। স্বদেশী বা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। বাগ্মিতার সঙ্গে তাঁর সাংবাদিক প্রতিভারও স্ফুরণ দেখা যায় এই সময় থেকেই। তিনি উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার' সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। 'সন্ধ্যার' আসরে যে ঐকতান বসত তার মধ্যে শ্যামসুন্দরেরও বলিষ্ঠ কণ্ঠ শোনা যেত—উপাধ্যায়ের লেখনীর মতো ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে তাঁরও লেখনী ছিল সুতীক্ষ্ণ। তারপর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রণভেরী বাজিয়ে এল 'বন্দে মাতরম্‌' যার পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন তিনজনের—বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দের লেখনী মিলিতভাবে অগ্নি বর্ষণ করত। বস্তুত 'বন্দে মাতরম্‌' পত্রিকায় শ্যামসুন্দরের সাংবাদিক প্রতিভা এক নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এরই পরিণতরূপ দেখা গিয়েছিল পনর বছর পরে তাঁর নিজস্ব 'সার্ভ্যান্ট' পত্রিকায়।

দেশসেবার পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন একাধিকবার। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলা শুরু হওয়ার অল্পকাল পরেই মরচেপড়া রেগুলেশন আইনের বজ্র নেমে এল তাঁর মাথার উপরে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন নম্বর রেগুলেশনে শ্যামসুন্দর অন্যান্য আর আটজন জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে ধৃত, বন্দী ও নির্বাসিত হন। তিনি সুদূর ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হয়েছিলেন ও চৌদ্দ মাসকাল থায়াটমো কারাগারে আটক ছিলেন। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আলি ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারতরক্ষা আইনে শ্যামসুন্দরকেও আবার আটক করা হয় এবং এই সময়ে তিনি দীর্ঘকাল কালিম্পংয়ে অন্তরীনাবদ্ধ ছিলেন। কালিম্পং থেকে প্রায় চার বছর পরে মুক্তিলাভ ক'রে শ্যামসুন্দর দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় যা করণীয় তা-ই করলেন—গান্ধীজীর অসহযোগ নীতিকে জানালেন স্বাগত। শুধু স্বাগত জানানো নয়, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই নীতিকে—যার অনুসরণে স্বাধীনতালাভ অচিরেই সুনিশ্চিত ব'লে ধারণা হয়েছিল—সর্ব ভারতে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে তিনি 'দি সার্ভ্যান্ট' নামে নিজস্ব একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ ক'রে তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় তখন অসহযোগের বাণীকে সমগ্র দেশে প্রচার করবার জন্য এই নবজাত দৈনিকটি খুবই সহায়ক হয়েছিল—একথা স্বয়ং গান্ধীজী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। শ্যামসুন্দরই ছিলেন বাঙ্গলার প্রথম অসহযোগী নেতা; কারণ নাগপুর কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনকে

অসহযোগের বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছে, যদিও রাওলাট আইনের প্রতিবাদ আন্দোলনের সময় থেকে গান্ধীজীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্যামসুন্দর ছিলেন নিষ্ঠাবান অসহযোগী, তা-ই দেখা যায় যে, পরবর্তীকালে স্বরাজ্য দলের প্রভাবে ভারতের রাজনীতিতে যখন নো-চেঞ্জার বা পরিবর্তনবিরোধী ও প্রো-চেঞ্জার বা পরিবর্তনকামী এই দুই দলের উদ্ভব হয় তখন শ্যামসুন্দর প্রথম দলেই রয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষ জীবনে তার মূল্যও দিতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু সে কথা থাক।

'সার্ভ্যাণ্টের' যুগ নানাদিক দিয়েই ছিল ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি নবযুগ—যেমন দেখা গিয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সেই অগ্নিস্রাবী যুগে। আবার নির্যাতিত এই দেশপ্রেমিকের জীবনেও এই সময়টা ছিল বিশেষ গৌরব প্রদীপ্ত। স্বল্পকাল স্থায়ী হ'লেও 'সার্ভ্যাণ্ট' এক নতুন সাংবাদিক গোষ্ঠী তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল ; ঐ সময়ে বহু তরুণ সাংবাদিকতায় তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে উত্তরকালে যশস্বী হয়েছিলেন। ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন তাঁদেরই একজন। 'The Servant of Shyamsunder was successful in creating a new school of journalism in Bengal just as the Bandemataram did during the first decade of this century.'[১] এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাঁর সম্পর্কে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য। 'Mother India' নামক কুখ্যাত গ্রন্থের লেখিকা মার্কিন মহিলা মিস ক্যাথারিন মেয়ো যখন ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উপহাস ক'রে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'The Slaves of the Gods' প্রকাশ করেন তখন তার সমুচিত উত্তর দেবার জন্য ভারতে একজন মানুষই ছিলেন। তিনি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তাঁর লেখনী থেকে আমরা সেদিন যে বইটি পেয়েছিলাম, 'My Mother's Picture', সেটি পাঠ ক'রে একদা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সতীর্থ শ্রীঅরবিন্দ যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এর ঠিক চোদ্দ বছর আগে ইংরেজ লেখক উইলিয়াম আর্চার ভারতীয় সভ্যতাকে আক্রমণ ক'রে 'Whither India' নামে যে বইটি লিখেছিলেন তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই দিক দিয়ে শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ ছিলেন সমধর্মী।

শ্যামসুন্দর চিরদিনই বে-হিসাবী লোক ছিলেন। তিনি একমনে দেশসেবা করতেন, কিন্তু সংসারের তত্ত্বাবধান বা পরিবার প্রতিপালনে তিনি ছিলেন উদাসী

১ *History of Journalism in Bengal :* Mohit K. Maitra

এবং অপটু। 'সার্ভ্যান্ট' পত্রিকার জন্মলগ্নেই যে রকম জনপ্রিয়তা দেখা গিয়েছিল তাতে এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করার কিছু ছিল না। সূচনাকালে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতা ছিল এই নতুন কাগজটির পিছনে, তথাপি উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে এই পত্রিকাখানি পাঁচ বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হতে পারেনি। সূচনাকাল থেকেই এর ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছিল এবং পত্রিকাটির অবলুপ্তির এটাই ছিল প্রধান কারণ। শক্তিশালী লেখকের অভাব কোনও ছিল না—অভাব ছিল সুষ্ঠু পরিচালনার। তার উল্লেখ নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে করেছেন।

কংগ্রেসের রাজনীতিতে যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসন্ন হয়ে এসেছিল কারাগারে থাকতেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র তার আভাস পেয়েছিলেন দেশবন্ধুর আলোচনা থেকে। বিষয়টা একটু খুলে বলা দরকার এখানে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ পরিপুষ্ট হয়ে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ আকার ধারণ করে। স্কুল, কলেজ, আদালত—সর্বক্ষেত্র থেকে অসংখ্য ব্যবহারজীবী, ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ তাঁর আন্দোলনের সামিল হতে থাকেন। ভারতবর্ষের কারাগারগুলি অসহযোগী বন্দীতে পরিপূর্ণ হতে থাকে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়েই গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসকে সংযুক্ত ক'রে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যস্থাপনে যত্নপর হন। তারপর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেসে নিরুপদ্রব আইনভঙ্গনীতি পরিগৃহীত হয়। গান্ধী ও সর্দার প্যটেল ব্যতীত বেশির ভাগ নেতা তখন কারান্তরালে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ় করার প্রয়াস মাত্রেই বোম্বাই নগরীতে হিন্দু-মুসলমানের বীভৎস দাঙ্গা উপস্থিত হয়। গান্ধীজী অনশনব্রত গ্রহণ ক'রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে চৌরিচৌরায় অহিংস সত্যাগ্রহ হিংসার রক্তে রঞ্জিত হ'লে অহিংসার পূজারী কোন নেতার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ ক'রে দেন।

কারাগারে থাকবার সময়েই দেশবন্ধু আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ভাষণ লিখে তাঁর সহোদরা উর্মিলাদেবীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সেটি পাঠ করেছিলেন সরোজিনী নাইডু। অসহযোগ আন্দোলন যখন আচম্বিতে প্রত্যাহৃত হয় তখন বাঙ্গলায় দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হন। যে আন্দোলনের ফলে এক বছরের মধ্যে ত্রিশ হাজার লোক কারাবরণ করেছিল সে আন্দোলনকে তার

সাফল্যের মধ্যপথে এইভাবে বন্ধ ক'রে দিয়ে গান্ধীজী তাঁর নীতিশুচিতার পরিচয় রেখেছিলেন বটে, কিন্তু ইতিহাসের বিপরীত পথে গিয়েছিলেন। সত্য ও অহিংসার নৈতিক পুজারী মাঝপথে আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন বটে, কিন্তু সরকারের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন হ'ল না। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই মার্চ গান্ধীজী গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনীতির পটপরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। পরিবর্তিত সেই পটভূমিকায় একজনের নেতৃত্বই সেদিন ফুটে উঠেছিল। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। গয়া কংগ্রেসের পরেই তাঁকে আমরা স্বরাজ্য দলের দলপতি হিসাবে দেখতে পাই। এই দল জনগণের আন্দোলনকে ব্যবস্থা পরিষদের চার দেওয়ালের মধ্যে নিয়ে যাবার কর্মসূচী রাখলেন দেশবাসীর সামনে। নতুন শাসনতন্ত্রের প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করে নি; এবার কংগ্রেস স্বরাজ্য দল আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে চাইল—উদ্দেশ্য দ্বৈতশাসন যে ভুয়া সেটা প্রমাণ করা।

নাগপুরে প্রতিশ্রুত 'এক বছরে স্বরাজলাভ' যখন অসার্থক প্রতিপন্ন হ'ল এবং কংগ্রেস অর্থাৎ দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল যখন পরিষদীয় রাজনীতির পথে পদক্ষেপ করতে উদ্যত হ'ল তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর পুরাতন অহিংস-অসহযোগের নীতিতে অটল রইলেন। তিনি খাঁটি গান্ধীবাদী ছিলেন, তাঁর পক্ষে স্বরাজ্য দলের কর্মসূচীতে আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব ছিল। এমন অবস্থায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি শ্যামসুন্দরের নেতৃত্বে কংগ্রেসের পুরাতন নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। নো-চেঞ্জার দলের মুখপত্র হিসাবে 'সার্ভ্যাণ্ট' আইন সভায় প্রবেশনীতির বিরোধিতা করতে থাকে।

কারামুক্তির পর শ্যামসুন্দরের 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। তাঁর এই নিয়োগে পরিচালকমণ্ডলী খুশি হয়েছিলেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন চারশত টাকা ধার্য হয়। কারাগার থেকেই শ্যামসুন্দর তাঁর এটর্নি কুমারকৃষ্ণ দত্তকে এই মর্মে একটি পত্র দিয়েছিলেন। কুমারবাবু তখন ঐ পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর একজন ছিলেন। 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিবরণ নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন:—

'জেল থেকে বেরিয়ে আমি যখন 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন এর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল; একটি পরিচালকমণ্ডলী ছিল বটে এবং কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই তাতে ছিলেন, কিন্তু একজন ব্যতীত তাঁদের কেউই পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতেন না। তখন শ্রীযোগেন্দ্র

মুখোপাধ্যায় ছিলেন 'সার্ভ্যান্টের' ম্যানেজিং ডাইরেক্টর; ইনি একটি কয়লাখনির মালিক এবং শ্যামসুন্দরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই তখন এই কাগজের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেছেন; আমাকে তাই নতুন লোক নিয়ে কাজ শুরু করতে হ'ল। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমি নিজেও একজন নবাগত ছিলাম; সাংবাদিকতার কোন জ্ঞানই আমার ছিল না, অর্থাৎ কিভাবে সম্পাদকীয় লিখতে হয়, কেমন ক'রে সংবাদের ওপর মন্তব্য করতে হয়, এসব বিষয়ে আমার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমাকে শুধু বলা হয়েছিল যে, খুব সহজবোধ্য ভাষায় লিখতে হবে যাতে অর্ধ শিক্ষিত পাঠকরা বুঝতে পারে; খুব উঁচুদরের ইংরেজিতে না লিখলেও চলবে, বরং খারাপ ইংরেজি ভাল। আর বলা হয়েছিল যে রাজদ্রোহ ও প্রেস আইন বাঁচিয়ে লিখতে হবে। সম্পাদনার অভিজ্ঞতা যেমন ছিল না, তেমনই পত্রিকা মুদ্রণের ব্যাপারটা আমার কিছু জানা ছিল না। সম্পাদকীয় বিভাগে নতুন যাঁরা যোগদান করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের বিনোদবিহারী দত্ত (ইনি পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনট্রোলার অব এগজামিনেশন হয়েছিলেন), আশুতোষ লাহিড়ী ও সুরেশ চক্রবর্তী। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ছিলেন দীর্ঘকালের একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক, কিন্তু পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না। তখন 'সার্ভ্যান্ট' পত্রিকার ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্যামসুন্দরের অনুজ গিরিজাসুন্দর; ইনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। অফিসে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, ছাপাখানাটির কাজও সুষ্ঠুভাবে চলত না, বিলের আদায়পত্র ঠিকমত হ'ত না এবং পিছনের দরজা দিয়ে উপার্জিত অর্থের অনেকখানি বেরিয়ে যেত।

'এই অবস্থার মধ্যে আমি দু'মাস চালিয়ে দিলাম এবং যদিও আমার নিয়োগের সময় বলা হয়েছিল যে আমি ও শ্যামসুন্দর যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে 'সার্ভ্যান্ট' চালাব, কিন্তু আমি পরিচালকদের বিশেষভাবে বলেছিলাম যে শ্যামসুন্দরের কারামুক্তির পর আমাকে যেন সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে মুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। আমার বেতন যা ধার্য হয়েছিল তার শতকরা পঞ্চাশভাগ মাত্র আমি পেতাম এবং আমার বন্ধুদের প্রস্তাব সত্ত্বেও আমি আমার বকেয়া প্রাপ্য আদায়ের জন্য কখনও পীড়াপীড়ি করিনি। শ্যামসুন্দর যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি আমার এই উদার মনোভাবের প্রশংসা করতেন।'

[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন 'সার্ভ্যান্ট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন

স্বনামধন্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ('ডন সোসাইটি' ও 'দি ডন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা) প্রায়ই 'সার্ভ্যাণ্ট' কার্যালয়ে আসতেন। তিনি নৃপেন্দ্রচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তাঁর লেখা সম্পাদকীয়গুলির খুব প্রশংসা করতেন ; বলতেন, এই সুন্দর রচনা তাঁকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্দে মাতরমের স্তম্ভে অরবিন্দ ঘোষের অতুলনীয় রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঠিক সেই রকম মৌলিক এবং সেই রকম কবিত্বপূর্ণ। সতীশচন্দ্র তাই নৃপেন্দ্রচন্দ্রের এই লেখাগুলির পুনর্মুদ্রণের জন্য তাঁকে বলতেন। পরবর্তীকালে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের লেখা কয়েকটি সম্পাদকীয় Gandhism in Theory and Practice এই নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গয়া কংগ্রেসে নৃপেন্দ্রচন্দ্র একজন প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ইতিহাসে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের বিশেষ গুরুত্ব এই ছিল যে, এইখান থেকেই কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়—একদল ছিলেন আইন সভায় প্রবেশের বিরোধী, নো-চেঞ্জার আর অপর দল ছিলেন আইন সভায় প্রবেশের স্বপক্ষে, প্রো-চেঞ্জার এবং তখন থেকেই কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান। বাঙ্গলায় নো-চেঞ্জার দলের নেতা ছিলেন শ্যামসুন্দর। নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রমুখ খাঁটি অসহযোগীরা ছিলেন তাঁরই অনুগামী। গয়া কংগ্রেসের সময় শ্যামসুন্দর কারাগারে। দেশবন্ধু কলিকাতায় ফিরে তাঁর স্বরাজ্য দলের জন্য একটি মুখপত্রের অভাব বোধ করতে থাকেন। অথচ তাঁর দলের অর্থসঙ্গতি বলতে তখন কিছুই ছিল না। 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন: 'গয়া কংগ্রেসের পরেই দেশবন্ধু একদিন সুভাষচন্দ্র কিরণশঙ্করকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকাটি স্বরাজ্য দলের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব ক'রে। ঠিক হয় যে, প্রধান সম্পাদক আমিই থাকব এবং দেশবন্ধুর নীতির সঙ্গে বিরোধ ঘটলে আমি স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ লিখতে পারব। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হতে পারি নি, কারণ তাহলে আমার ওপর শ্যামসুন্দর যে বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলেন তার চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হ'ত।'

মানুষ হিসাবে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যে কত মহৎ ছিলেন তা তাঁর সমগ্র জীবনের এই একটিমাত্র ঘটনা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর স্থলে অন্য কেউ যদি তখন 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন তাহলে দেশবন্ধুর পক্ষে ঐটি হস্তগত করা হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ হ'ত। এই গুণেই ত' বাঙ্গলার রাজনীতিতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র একটি অনন্যলব্ধ গৌরবের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

এইবার আমরা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সাংবাদিক জীবনের দ্বিতীয় পর্বের কথা বলব। কিন্তু তার আগে বাঙ্গলার সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি এখানে একটু তুলে ধরা দরকার। গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা যেন সহসা অন্য পথে মোড় নিল। বিগত কয়েকমাসের প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিবর্তে গভীর নৈরাশ্যে নিমগ্ন হ'ল সমগ্র দেশ এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের রাজনৈতিক চেতনা অবসাদে আচ্ছন্ন হ'ল। দেশের সামনে তাঁরা নতুন কোন কর্মসূচী উপস্থিত করতে পারলেন না, অথবা নতুন কোন আন্দোলনের কথাও বললেন না। চৌরিচৌরার ঘটনার পর কারাগারে থাকতেই দেশবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সাহায্যে বুঝেছিলেন যে এখন কংগ্রেসের কার্যক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন। গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভা আইনসভায় প্রবেশের ভিতর দিয়ে কিভাবে দেশকে মুক্তিসংগ্রামের পথে নিয়ে গিয়েছিল এবং কেমন ক'রেই বা তিনি সেই রাজনৈতিক অবসন্নতার দিনে দেশবাসীর মনে এক নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন সেই ইতিহাস সুপরিচিত। গয়া কংগ্রেসের পর স্বরাজ্য দলের উদ্ভবের সময় থেকে পরবর্তী আড়াই বৎসরকাল অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁর লোকান্তরগমনের সময় পর্যন্ত ভারতের রাজনীতির কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন একজনই। তিনি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। জাতির তিনিই ছিলেন সেদিন অবিসম্বাদী নেতা, স্বরাজরথের সারথি।

গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণেই দেশবন্ধু সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে গান্ধীজীর কর্মসূচী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর নতুন নীতি—আইনসভায় প্রবেশ—দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করেন। কিন্তু গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর আইনসভায় প্রবেশনীতির সমর্থনে প্রতিনিধিদের মধ্যে চব্বিশজনের বেশি সমর্থক পাওয়া যায় নি। বিষয়নির্বাচনী সভায় যখন কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাবটি উত্থাপিত হ'ল তখন সেই প্রস্তাবের সমর্থনে প্রদত্ত হয় ৮৯০টি ভোট আর বিরুদ্ধে ১৭৪৮টি ভোট। গয়া কংগ্রেসের পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই দেশবন্ধুর নির্দেশে মতিলাল নেহরু একটি নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই দলের নাম দেওয়া হয় 'স্বরাজ্য দল'। এঁরা দুজনেই তখন যথাক্রমে কংগ্রেসের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। গয়াতেই ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে (১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ ১লা জানুয়ারী) স্বরাজ্য দলের জন্ম কংগ্রেসের রাজনীতিতে নিয়ে এল একটা নতুন দিক্-পরিবর্তন। স্বরাজ্য দল স্থাপন ক'রে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশবন্ধু সেদিন

বিদ্রোহের পতাকা তুলেছিলেন, এই কথা যাঁরা বলেন তাঁরা ইতিহাসের অভিপ্রায়কে ঠিকভাবে বুঝতে পারেন নাই।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে ইচ্ছা হয় স্বরাজ্য দলের প্রচারকার্যে অভিযানরত দেশবন্ধুর একটি বক্তৃতা। এটি তিনি দিয়েছিলেন মাদ্রাস শহরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায়। বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনাকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছিলেন: 'Am I a rebel? I would rather rebel against the Congress and any institution in India if I feel that the realisation of the demand of Swaraj makes it necessary. I want Swaraj, I want my liberty. I am prepared to fight. I have not been a coward in my life. I want to fiight and if necessary, I am prepared to lay down my life.' স্বরাজ্য দল গঠনে তাঁর একটি মাত্র যুক্তিই ছিল—দল নয়, দেশ; দেশের ও জাতির স্বার্থেই সেদিন এই বিদ্রোহের প্রয়োজন হয়েছিল।

স্বরাজ্য দল যখন প্রাদেশিক কংগ্রেস দখল করলেন তখন বাঙ্গলার রাজনৈতিক আসরে নো-চেঞ্জার বা খাঁটি অসহযোগীদের আর বিশেষ কোন স্থান ছিল না, তাঁরা অনেকটা কোণঠাসা অবস্থায় রইলেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই দলের হ'লেও এই প্রদেশে কংগ্রেসীদের মধ্যে তাঁর একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ এবং এই জন্যই কংগ্রেসের দুই শিবিরেই তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তি খুবই অকপট এবং সেটি এখানে স্মর্তব্য: 'I was an independent in the ranks of Bengal Congressmen and I was nobody's parasite and looked at things and measures by my personal yard-measure.' এমন অবস্থায় বাঙ্গলার রাজনীতিতে তাঁর করণীয় কিছু ছিল না। নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে নাগপুরে নিঃ ভাঃ কং কমিটির সভায় যোগদান করতে এসে দৈবক্রমে তিনি কমিটির ব্রহ্মদেশের সভ্য মদনজিতের সঙ্গে পরিচিত হন। এঁর সঙ্গে তিনি পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। মদনজিৎ তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করেন তিনি কি করছেন তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র অকপটেই উত্তর দিলেন: 'I am doing nothing and the atmosphere of Bengal politics is not very agreeable to me.' তারপর মদনজিৎ যখন আবার জিজ্ঞাসা করেন, এমন অবস্থায় তিনি কি করতে চান, তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁকে সোজাসুজি বললেন: 'বাঙ্গলার রাজনীতি পরিত্যাগ ক'রে দূরে এমন

কোথাও চলে যেতে চাই-যেখানে আমাকে আমার বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে না।' এখানে তিনি বাঙলার সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করেছেন তা একজন আদর্শবাদীর কথা, বাস্তববাদীর নয়।

ব্রহ্মদেশে দুই বৎসর

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ। মে মাস।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর।

নাগপুরে মদনজিৎ যখন প্রস্তাব করলেন যে, 'রেঙ্গুন মেইল' পত্রিকার সম্পাদক কারাগারে এবং পরিচালকমণ্ডলী তাঁকে আর ঐ পদে রাখতে সম্মত নন, এমন অবস্থায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র যদি ইচ্ছা করেন তাঁর ঐ কর্ম গ্রহণ করতে পারেন। 'রেঙ্গুন মেইল' পত্রিকাটি সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হ'ত এবং এর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার জে. আর. দাশ—দেশবন্ধুরই খুড়তুতো ভাই। ইনি পরে রেঙ্গুন হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। মদনজিতের প্রস্তাবক্রমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর সমস্ত বিবরণসহ পত্রিকার চেয়ারম্যানকে একটি তারবার্তা পাঠালেন। কিছু দিন বাদেই তিনি তাঁর নামে একটি নিয়োগপত্র প্রেরণ করলেন। 'মাইনে খুব বেশি ছিল না, তবে রেঙ্গুনে আমার পরিবারবর্গের চলার পক্ষে উপযুক্ত ছিল। কলিকাতা অপেক্ষা রেঙ্গুনে জীবনধারণ করা খুব মহার্ঘ ছিল।'

তাঁর রেঙ্গুন যাত্রার পূর্বে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। ফরিদপুর জেলায় চরমানাইর নামক স্থানে হানা দিয়ে পুলিশ একটি গ্রাম লুট করে এবং স্ত্রীলোকদের ওপর বলাৎকার এবং আরও নৃশংস কাণ্ড করে। প্রদেশ কংগ্রেসে তখন স্বরাজ্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠ; কংগ্রেস থেকে চরমানাইরে অনুষ্ঠিত পুলিশী নৃশংসতার তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ঐ কমিটির অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। আদর্শগত মতানৈক্য সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র ও মৌলানা আজাদ সকলেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে পছন্দ করতেন ও তাঁর নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতেন। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। তদন্তের রিপোর্ট পুলিশের বিরুদ্ধেই ছিল; এই রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পরেই নতুন কার্যভার গ্রহণের জন্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র রেঙ্গুন যাত্রা করেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে দেশবন্ধুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দুই বৎসর তিনি রেঙ্গুনে

অবস্থান করেছিলেন। 'রেঙ্গুন মেইলের' সম্পাদক হিসাবে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের খ্যাতি সেদিন সমগ্র ব্রহ্মদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজে তিনি যেমন শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিলেন তেমন ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের কাছেও বিশেষ ক'রে ব্রহ্মদেশীয় রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তাঁর সমাদর বড় কম ছিল না। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য ও অনমনীয় দৃঢ়তা, তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব, তাঁর পাণ্ডিত্য এবং সর্বোপরি তাঁর দেশপ্রেম ও কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে সেদিন সুদূর ব্রহ্মদেশে আপামর জনসাধারণের কাছে প্রিয় ক'রে তুলেছিল। তাঁর সাংবাদিক প্রতিভারও সমধিক পরিণতি এই পত্রিকার স্তম্ভেই দেখা গিয়েছিল। রেঙ্গুনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি তাঁর যোগ্য স্থান ক'রে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মোট কথা, তাঁর জীবনে রেঙ্গুন অধ্যায় সকল দিক দিয়েই ছিল একটি গৌরবময় অধ্যায়। এখানে আসার অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালী, গুজরাতি, পঞ্জাবী, মারাঠী, মাদ্রাসী, প্রভৃতি রেঙ্গুনপ্রবাসী সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান তিনি লাভ করেছিলেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র একজন প্রকৃত কর্মীপুরুষ ছিলেন, যখন যেখানে থাকতেন সেখানেই তিনি তাঁর চারদিকে কর্মের একটি প্রচণ্ড প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারতেন। কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে তিনি নিজেকে কখনও সীমাবদ্ধ রাখতেন না। কি তাঁর শিক্ষক জীবনে, কি রাজনৈতিক জীবনে, কি সাংবাদিক জীবনে—সব সময়েই তিনি বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিতেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে, রেঙ্গুনে আসার পর তাঁর এই স্বাভাবিক কর্মস্পৃহা যেন বহুমুখী হয়ে ব্রহ্মদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করেছিল। এখানকার সকল শ্রেণীর অধিবাসীর জীবনে তিনি যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এই কারণেই তাঁর জীবনে যেমন আমাদের জাতীয় জীবনেও তেমনই নৃপেন্দ্রচন্দ্রের দুই বৎসরকাল ব্যাপী এই প্রবাস জীবন স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টি আমরা তাই একটু বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করব।

রেঙ্গুনে আসার অল্পদিন পরে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর পরিবারবর্গকে কলিকাতা থেকে এখানে নিয়ে আসেন। ব্রহ্মদেশে একদিন যিনি একজন সম্পূর্ণ আগন্তুক হিসাবেই প্রবেশ করেছিলেন তিনিই তিনমাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই সকলের কাছে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। রেঙ্গুনের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়টির নাম ছিল বেঙ্গল অ্যাকাডেমি—এখানে শুধু বাঙ্গালী ছেলেরাই পড়ত। ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মপ্রবক্তা পণ্ডিত সীতানাথ

তত্ত্বভূষণের জামাতা মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন গিরিডি ও শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, মোহিতবাবুর সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় হয়েছিল। রেঙ্গুনের মিশনারি-পরিচালিত কলেজটির নাম ছিল জাডসন কলেজ; এখানে ইতিহাসের অধ্যাপক সরোজ সেন ছিলেন তাঁরই স্বগ্রামবাসী। প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর গুজরাতি বন্ধু মদনজিৎ ব্যতীত রেঙ্গুনে এই দুজনই নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন।

চট্টগ্রামের বহুলোক রেঙ্গুনে কার্যব্যপদেশে বাস করতেন। 'রেঙ্গুন মেইল' পত্রিকার নতুন সম্পাদকের নাম যখন তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তখন তাঁরা সকলে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের আশেপাশে এসে ভীড় ক'রে দাঁড়ালেন, কারণ তাঁরা জানতেন যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে যে আন্দোলন হয়েছিল তার পরিচালক দুজনই ছিলেন—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই স্থানীয় ওয়াই. এম. সি. এ.-র কর্মীদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন; রেঙ্গুনের সকল সামাজিক কর্মে এঁরাই ছিলেন অগ্রণী আর এঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ। 'রেঙ্গুন মেইলের' পৃষ্ঠায় সম্পাদক হিসাবে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বিশেষ সহৃদয়তার সঙ্গে জনমতকে স্থান দিতেন ব'লেই না অত শীঘ্র তিনি ব্রহ্মদেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন।

'রেঙ্গুন মেইল' ছিল একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা এবং সম্পাদক হিসাবে নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেসের সংবাদ পরিবেশন অথবা বাঙ্গলার রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিচয় এই পত্রিকার স্তম্ভে আগে ঠিকমতো প্রতিফলিত হ'ত না। কিন্তু নৃপেন্দ্রচন্দ্র সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে এই পত্রিকায় কংগ্রেস তথা বাঙ্গলার রাজনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পরিবর্তন কাগজটিকে সেদিন রেঙ্গুনের অধিবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল।

মদনজিতের মাধ্যমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্রহ্মদেশের তৎকালীন অবিসম্বাদী জননায়ক রেভারেণ্ড ইউ. উত্তমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ইনি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভারত-ব্রহ্মদেশ মৈত্রীর প্রবল সমর্থক ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি একজন আদর্শবাদী ছিলেন। বাঙ্গলা ও ভারতের বহুস্থান তিনি পরিভ্রমণ ক'রে এখানকার বহু জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পরিচিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে পূজ্যপাদ উত্তম তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। উত্তমের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক দল ছিল, তার নাম ওয়ানথানু দল—এটাই সেদিনকার

ব্রহ্মদেশের বামপন্থীদল ছিল। ব্রহ্মদেশের জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ—যাদের উগ্রপন্থী ও ব্রিটিশবিদ্বেষী বলা চলে—এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাজার হাজার বর্মী ফুঙ্গী ও মহিলা এই দলের সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক দল হিসাবে উত্তমের এই দল খুবই প্রভাবশালী ছিল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও তাঁর পত্রিকার সমর্থন তিনি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ব্রহ্মদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে দক্ষিণ ভারতীয়দের যেমন একচ্ছত্র প্রভাব বিদ্যমান ছিল তেমনই এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের উপর ছিল বাঙ্গালীর প্রভাব। কিন্তু সম্পন্ন বাঙ্গালীরা সাহেবী বেশ ও আচরণের দ্বারা নিজেদের দরিদ্র ভারতীয়দের থেকে স্বতন্ত্র রাখতেন। নিজ বেশ, আচরণ ও বক্তৃতার দ্বারা নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই অসঙ্গতি দূর করেন। আধুনিক রেঙ্গুন বলতে গেলে বাঙ্গালীর সৃষ্টি। অন্যদিকে বাঙ্গালী শিক্ষক, বাঙ্গালী চিকিৎসক, বাঙ্গালী আইন-ব্যবসায়ী—এইসব স্তরে বাঙ্গালী বর্মীদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্মীদের জীবনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র এখানে এসে লক্ষ্য করেন যে, বিদেশীদের প্ররোচনায় একদল বর্মীদের মধ্যে ভারতবিদ্বেষভাব খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। ভারত থেকে পৃথক হওয়ার দাবীটা তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু বর্মীরা সাধারণত অলস প্রকৃতির,. কায়িক পরিশ্রমবিমুখ। তাই এখানকার বন্দরে ও কল-কারখানায় দক্ষিণ ভারত ও মালাবারের শ্রমিকদের আধিপত্য ছিল। ভারতবিদ্বেষের মূলে ছিল স্থানীয় শ্বেতাঙ্গদের উস্কানি।

কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ব্রহ্মদেশের প্রকৃত জাগরণ শুরু হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সারাভারত যখন অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের ফলে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তখন তার ঢেউ এখানে এসে বর্মীদের মনের তটে আঘাত করেছিল। ফলে ঐ বছরে এখানে প্রবল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। স্যার হারকোর্ট বাটলার ছিলেন তখন ব্রহ্মদেশের গভর্নর। তিনি কঠোর হস্তেই এই আন্দোলন দমন করেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশের একশ্রেণীর জাতীয়তাবাদীর অন্তরে ইংরেজবিদ্বেষ তখন স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা পরোক্ষভাবে ব্রহ্মদেশের শিক্ষিতদের মনে ইংরেজবিদ্বেষের ভাব সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিল। ব্রহ্মদেশের তৎকালীন রাজনীতিতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজে কি অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেই বিষয়ে আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন: 'I used the *Rangoon Mail* to popularise the concept of Indo-Burmese unity and to infect the Burmese English-educated youth and politicians with

the ideas dominating the Indian National Congress. I worked and spoke by the side of Ottama on many platforms; I took a rather leading part in popularising and explaining the movement against Capitation Taxes launched by Ottama and other Burmese left-wingers in 1924.'

নৃপেন্দ্রচন্দ্র যে দুই বৎসরকাল ব্রহ্মদেশে ছিলেন তার মধ্যেই স্বরাজ্য দলের নেতা চিত্তরঞ্জন ক্ষমতার শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নিজে যদিও একজন 'নো-চেঞ্জার' ছিলেন তথাপি স্বরাজ্য দলের সাফল্যের সংবাদ, যেমন কলিকাতা পৌরসভা অধিকার, নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। তারপর বাঙ্গলা সরকার যখন দেশবন্ধুর রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস করবার অভিপ্রায়ে তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সুভাষচন্দ্রকে ও আরও অনেককে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত করেন—সেই সংবাদও 'রেঙ্গুন মেইলে' বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব বাঙ্গালী (এঁদের মধ্যে তাঁর বন্ধু বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষও ছিলেন) যখন ব্রহ্মদেশের মান্দালয় কারাগারে অবস্থান করছিলেন তখন এঁদের সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করার ব্যাপারে তিনি যে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন তা একমাত্র তাঁর মতো একজন নির্ভীক স্বাধীনতাকামীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই সব রাজবন্দীদের অভাব-অভিযোগের সংবাদ, তাঁদের শারীরিক স্বাস্থ্যের সংবাদ কলিকাতার পত্র-পত্রিকায় একমাত্র নৃপেন্দ্রচন্দ্রের চেষ্টাতেই সেদিন প্রকাশিত হতে পেরেছিল। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি।

ব্রহ্মদেশের কারাগার থেকে বাঙ্গালী রাজবন্দীরা সেদিন তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়ে ভারতসচিবের কাছে যে খোলা চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন সেই চিঠিটির একটি নকল নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোপনে সংগ্রহ ক'রে 'রেঙ্গুন মেইল' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই চিঠির একটি নকল তিনি দেশবন্ধুর 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। এইভাবে রাজবন্দীদের ওপর নৃপেন্দ্রচন্দ্র সর্বদা তাঁর সতর্ক ও সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। দেশবন্ধু যখন তাঁর নিজস্ব পত্রিকার অংশ বিক্রী করার জন্য রেঙ্গুনে তাঁর একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখেছিলেন তখন তিনি এই বিষয়ে তাঁর সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন, যদিও তাঁর নিজের কাগজের আর্থিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না। বহু মতান্তর হ'লেও (রাজনীতিতে মতান্তর অবশ্যম্ভাবী) দেশবন্ধুর সেই ব্যক্তিগত পত্র নৃপেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়কে যে গভীরভাবেই স্পর্শ করেছিল তা আমরা অনুমান করতে

পারি। আদর্শবাদী হিসেবে তিনি যে কতখানি মহান ও উদার ছিলেন এটি তার একটি নিদর্শন।

ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে পঞ্জাবের একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কি রকম সহায়তা করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া দরকার। জলন্ধরে আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠিত একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; তার নাম জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়। এই বিদ্যানিকেতনের অর্থসঙ্কট দেখা দিলে একদল আর্যসমাজী ঐ বিদ্যানিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা লালা দুনিরাজের নেতৃত্বে রেঙ্গুনে অর্থ সংগ্রহের জন্য এই সময়ে এসেছিলেন। এই দলে ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ও প্রসিদ্ধ মহিলা কংগ্রেসকর্মী, শ্রীমতী শান্নো দেবী, কুমারী সত্যবতী ও আরও কয়েকজন। লালা দুনিরাজ রেঙ্গুনে পদার্পণ করার অব্যবহিত পরেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁদের ব্রহ্মদেশে আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন:

'তাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার সক্রিয় সহানুভূতি ও সহায়তা চাইলেন। আমি কয়েকটি জনসভার আয়োজন করলাম, তাঁদের জন্য সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করলাম। এছাড়া, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্র ইউনিয়নকে ভারত থেকে আগত এই সব শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত কর্মীদের যথোপযুক্ত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য অনুরোধ করলাম। আমার কাগজে জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে প্রচার করলাম। প্রত্যেকটি জনসভায় তাঁদের প্রদত্ত হিন্দীভাষণ আমি ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে শ্রোতাদের সামনে পরিবেশন করলাম। এইভাবে আর্যসমাজীদের এই সৎকাজের অনুকূলে রেঙ্গুনে জনমত গড়ে উঠেছিল। অর্থসংগ্রহের জন্য যে তহবিল খোলা হয় তাতে প্রথম চাঁদা পঁচিশ টাকা দান করেছিলেন আমার সহধর্মিণী। প্রতিনিধিদল ব্রহ্মদেশে পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।'

নৃপেন্দ্রচন্দ্র যে রকম আন্তরিকতার সঙ্গে আর্যসমাজীদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছিলেন তাতে প্রতিনিধিদলের প্রত্যেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি নিজে শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষার মূল্য বুঝতেন, বুঝতেন যে দেশের ভবিষ্যৎ সুশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের ওপর নির্ভর করে। তাইতো রেঙ্গুনে এসে লালা দুনিরাজ যখন তাঁর সহায়তা চেয়েছিলেন তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র অকুণ্ঠভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর এই উদারতা তাঁরা চিরদিন স্মরণে রেখেছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দেবার জন্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

'রেঙ্গুন মেইলের' সহকারী সম্পাদক থেকে কর্মাধ্যক্ষ, বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, ইপিস্ট থেকে কম্পোজিটার, প্রেসের ফোরম্যান সবাই ছিল দক্ষিণভারতী। গেই বলেছি কাগজটি সপ্তাহে তিন দিন ক'রে প্রকাশিত হ'ত এবং সেই রণেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রের অবসর ছিল প্রচুর—সেই অবসরে তিনি তাঁর সামাজিক, জনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য সম্পাদন করতেন। ভারতীয় ও বিদেশীয় বহু ı-পত্রিকা পাঠ করার সময়ও তিনি পেতেন প্রচুর। সেগুলি তিনি খুব মনোযোগ কারে পাঠ করতেন। 'আমার সব চেয়ে বেশি ভালো লাগত লাহোর থেকে কাশিত ও কালীনাথ রায়ের সম্পাদিত 'ট্রিবিউন' পত্রিকা। তাঁর লেখা পাদকীয়গুলি সকল দিক দিয়েই আমার কাছে আদর্শস্থানীয় ব'লে মনে হ'ত ং আমি তাঁরই অনুসরণে আমার সম্পাদকীয়গুলি লিখবার চেষ্টা করতাম।'

'রেঙ্গুন মেইলের' সম্পাদক হিসাবে নৃপেন্দ্রচন্দ্র সত্যিই অসামান্য জনপ্রিয়তা র্জন করেছিলেন। তাঁর সম্পাদকীয়গুলি শুধু যে সুন্দর ইংরেজিতে লিখিত হ'ত নয়, প্রত্যেকটি সম্পাদকীয় যেমন যুক্তিপূর্ণ তেমনই গঠনমূলক চিন্তায় ভাস্বর হত। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কাগজ, তাই ব্রহ্ম সরকারের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতির ঠার সমালোচনা করতে তিনি কখনও দ্বিধা করতেন না। কিন্তু তাঁর এই লোচনা কোথাও শালীনতাকে অতিক্রম করত না। এইজন্য আমলাতন্ত্র ন্ত 'রেঙ্গুন মেইলের' অনুরক্ত হয়ে উঠেছিল। একজন সাংবাদিকের পক্ষে এটা কম সাফল্যের পরিচায়ক ছিল না। রেঙ্গুনে নৃপেন্দ্রচন্দ্র খুবই কর্মব্যস্ত জীবন ান করেছিলেন। যে কোন রাজনৈতিক সভায় তাঁর উপস্থিতি অপরিহার্য । উঠেছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংবাদে তিনি এতদূর অভিভূত হয়েছিলেন যে, এই উপলক্ষে রেঙ্গুনের রাম হলে একটি মহতী শোকসভার আয়োজন করেছিলেন। এই সভায় র জনসমাগম হয়েছিল।

কিন্তু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মালয় ও যবদ্বীপের পথে রবীন্দ্রনাথের রেঙ্গুনে মন একটি বিশিষ্ট ঘটনা ছিল। রবীন্দ্রনাথকে উপযুক্ত সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ন্দ্রচন্দ্রের উদ্যোগে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। এই সময়ে দিনের পর তিনি 'রেঙ্গুন মেইল'-এ প্রচারকার্য চালিয়ে ব্রহ্মদেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে াবে রবীন্দ্র-সচেতন ক'রে তুলেছিলেন সেই কথা বলতে গিয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর ্মচরিতে অকপটে লিখেছেন: 'My pen was not idle and Tagore s a theme that could never have been exhausted by a Tagore-

enthusiast like myself'. রেঙ্গুনের টাউন হলে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সভার পক্ষ থেকে কবিকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল সেটিই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই সভায় তাঁকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় সেটি রচনা করেছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র মাত্র চল্লিশ পঙক্তির মধ্যে তিনি রবীন্দ্রপ্রতিভার যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কবি স্বয়ং সেটির প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যাঁর আজীবনের ধ্যান-জ্ঞান, যিনি রবীন্দ্র-কবিতার অনুরাগী পাঠক, তাঁর পক্ষে এই কাজটি যে খুব কঠিন ছিল তা নয়। কিন্তু চল্লিশ পঙক্তির একটি মানপত্রের মধ্যে রবীন্দ্রমনীষার এমন নিখুঁত পরিচয় তুলে ধরা একটি অসাধ্যসাধন বললে অত্যুক্তি হবে না।

রবীন্দ্রনাথের রেঙ্গুন দর্শনের কয়েক মাস পরে এখানে এলেন চার্লস ফ্রায়ার এণ্ড্রুজ। [চট্টগ্রামে থাকতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই মহাপ্রাণ ও ভারত-প্রেমিক ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই অন্তরঙ্গতার স্বাক্ষর আছে 'দি আইডিয়ালস অব স্বরাজ' গ্রন্থে। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের এই প্রথম গ্রন্থে এণ্ডুজ একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজে উদ্যোগী হয়ে তিনি তরুণ দেশপ্রেমিকের এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছিলেন এমন উদারতা একমাত্র এণ্ড্রুজের পক্ষেই সম্ভব।] সেই উপলক্ষে নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্থানীয় জুবিলী হলে তাঁর সম্মানার্থে এক বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। রেঙ্গুনের জনসাধারণের পক্ষ থেকে ঐ সভায় তাঁকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়েছিল, সেটিও ছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের রচনা।

এই মহাপ্রাণ ইংরেজ সম্পর্কে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন তা তিনি এইভাবে তাঁর আত্মচরিতে ব্যক্ত করেছেন: 'C. F. Andrews has been like an elder brother to me. He was a true Christian. An indissoluble link between Gandhi and Tagore, he was also one of the finest links between cultured India and cultured Britain I have spent days with him and never found a frown or an uncharitable remark or an angry word to pass his lips Charity, that universal solvent, that sweetest and gentlest of all virtues, was ingrained in him: Compassion for and love the poor, the needy, the dispossessed and the disinherited the earth was his in abounding measure...he flashes before my mind as an angel of peace, a force for harmony and conciliation

bridge-builder between warring ideologies and camps. Andrews can never be forgotten by us. He is one of the immortals, a Christ-like personality…' নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর জীবনে বহু বিরাট ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেই এই আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের চরিত্র-নিষ্ঠায় ও কর্তব্যবোধে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের অনেকের চরিত্রচিত্র পাওয়া যাবে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের লেখা 'প্রফেটস অ্যাণ্ড পেট্রিয়টস' বইটির মধ্যে।

'রেঙ্গুন মেইল' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কাহিনীটি এইবার বলি। আগেই বলা হয়েছে যে এই পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন ব্যারিস্টার জ. আর. দাশ। নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই পত্রিকার সম্পাদক হয়ে আসার পর থেকে দাশ সাহেব ক্রমশ জাতীয়তাভাবাপন্ন হয়ে উঠতে থাকেন। রেঙ্গুনের ভারতীয় সমাজে তিনি তখন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। গভর্নর হারকোর্ট বাটলার চতুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মিস্টার দাশকে হাইকোর্টের একজন বিচারপতি নিযুক্ত করলেন। তখন তাঁকে 'রেঙ্গুন মেইল'-এর পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে আসতে হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সাহিত্যিককে তাঁর সহকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নতুন চেয়ারম্যান এসেই বললেন নব নিযুক্ত সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন নেই। স্বাধীনচেতা নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর কার্যে এই রকম হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিলেন।

এই সংবাদ যখন স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজে ছড়িয়ে পড়ল তখন তাঁরা নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে সমর্থন করলেন। তিনি ব্রহ্মদেশ থেকে চলে গেলে ভারতীয় স্বার্থ রাখবার বা তার জন্য সংগ্রাম করবার আর কেউ থাকবে না। তাই তাঁর পদত্যাগের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাঙ্গালী অধিবাসীদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে একটি নতুন ইংরেজী দৈনিক প্রকাশ করা হবে এবং তিনিই হবেন সেই পত্রিকার সংগঠন-সম্পাদক। এই ঘটনা ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। ঠিক হ'ল নতুন কাগজের নাম হবে 'দি বার্মা ক্রনিকল্'; মার্চমাস থেকেই শেয়ার বিক্রীর কাজ শুরু হয়। নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজে এই উপলক্ষে মান্দালয়, মেমিয়ো প্রভৃতি কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করেন। সর্বত্রই প্রচুর সংখ্যায় শেয়ার বিক্রী হয়। 'সকল জায়গায় ভারতীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে আমি যে অভ্যর্থনা লাভ করেছিলাম তা কোনদিনই বিস্মৃত হবার নয়। প্রত্যেক স্থানেই আমাকে আপ্যায়িত

করার জন্য পার্টি দেওয়া হয় এবং সকলেই শেয়ার কিনতে আগ্রহ প্রদর্শ করে

এইভাবে ত্রিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। নূতন পত্রিকা বের করার উৎসাহ উদ্দীপনায় যখন নৃপেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় ভরপূর তখন আচম্বিতে ১৭ই জুন সংবাদ এল যে আগের দিন দার্জিলিঙয়ে দেশবন্ধু মারা গেছেন। তাঁর কাছে এই সংবাদ ছিল যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের তুল্য। 'তখনি একটি বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে হ'ল যে, ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ ক'রে, এখানকার ভবিষ্যৎ উন্নতিতে জলাঞ্জলি দিয়ে আমি যেন শীঘ্র বাঙ্গলায় ফিরে যাই। সেখানে আমার প্রয়োজন হতে পারে দেশবন্ধু নেই, সুভাষ ও তার সঙ্গে প্রথম সারির সমস্ত দেশপ্রেমিক কারাগারে আবদ্ধ। সেনগুপ্ত, শাসমল ও কিরণশঙ্কর—মাত্র এই তিনজন নেতা তখন বাইরে ছিলেন।' চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। দেশবন্ধুর তিরোধানের পর নৃপেন্দ্রচন্দ্র আবার বাঙ্গলার রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এতদিন প: তিনি ছিলেন পূর্ণ গান্ধীপন্থী নো-চেঞ্জার।

দেশবন্ধুর মৃত্যু ও বাঙ্গলার রাজনীতি

১৬ই জুন, মঙ্গলবার, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

২রা আষাঢ়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ। ঐদিন অপরাহ্নকালে হিমালয়ের পাদমূলে কর্মক্লান্ত ও রোগজীর্ণ দেহভার রক্ষা ক'রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শতযুদ্ধের বিজয়ী বীর চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙ্গলার আশাভরসা সঙ্গে নিয়ে লোকান্তরে গমন করলেন লোককান্ত মহান নেতা অকালে অন্তর্হিত হলেন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র থেকে এক বিরাট শক্তিমান পুরুষ। সকলের দৃষ্টির অন্তরালে মহাপ্রস্থান করলেন এক স্বপ্নদ্রষ্টা, এক অক্লান্ত যোদ্ধা —নবযুগের শৃঙ্খলমুক্ত প্রমেথুস। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ আচম্বিতে প্রত্যক্ষ করল এক অভাবনীয় ইন্দ্রপতন। চিরদিনের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল নবকেশরীর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর যা একাদিক্রমে পাঁচটি বছর ধরে ভারতের চারিপ্রান্তে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রবলপ্রতাপ শাসকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।

সেদিন, ৪ঠা আষাঢ়ের সেই বিষাদমলিন দিনটিতে, শ্মশানে চিতাগ্নির লেলিহান

শিখায় যা পার্থিব, যা নশ্বর, যা ক্ষণস্থায়ী তা চক্ষের নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু সেই চিতাভস্মের মধ্যে উৎকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল একটি মৃত্যুঞ্জয়ী নেতৃত্বের ইতিহাস যা ত্যাগে উজ্জ্বল, দেশসেবায় অনন্যসাধারণ আর সংগ্রামে অপরাজেয়। উত্তরপুরুষ একদিন সেই ইতিহাস স্মরণ করবে আর শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে বলবে: এই বাঙ্গলার একটি প্রাণবন্ত মানুষ তাঁর অলৌকিক ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ দ্বারা তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগকে রূপান্তরিত করেছিলেন একটি আধ্যাত্মিক শক্তিতে আর প্রচলিত রাজনীতির সঙ্কীর্ণ ধ্যানধারণাকে অতিক্রম ক'রে তিনি স্পর্শ করেছিলেন ভারত-আত্মার যথার্থ তন্ত্রীটিকে। এইখানেই দেশবন্ধুর জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। সেদিনের সেই চিতাগ্নির আলোকে একটি মৃত্যুহীন প্রাণের যে উদ্ভাসন বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল, তা তাঁর স্বজাতির স্মৃতিপটে আজও অম্লান হয়ে আছে, থাকবেও চিরকাল। দেশবন্ধুর এই মৃত্যু মৃত্যু নয়—এ ছিল যেন স্বদেশ-সেবাযজ্ঞে একটি পরিপূর্ণ আত্মাহুতি। ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে একটা নবীন প্রেরণা সঞ্চারিত ক'রে দেওয়ার জন্য বুঝি এমনই একটি মহিমান্বিত আত্মাহুতির প্রয়োজন ছিল।

মনে পড়ে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মহাত্মা গান্ধীর সেই অপূর্ব শোকাঞ্জলি: তিনি শতযুদ্ধের বিজয়ী বীর ছিলেন।…শুধু বাঙ্গলার উপর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের উপর দেশবন্ধুর অসীম প্রভাব ছিল। ভারতের জনসাধারণের তিনি প্রিয় ছিলেন। তাঁর অসাধারণ ত্যাগ ছিল। তাঁর উদারতারও সীমা ছিল না। তাঁর প্রেমময় হস্ত সকলকে গ্রহণ করবার জন্যই প্রসারিত ছিল। তিনি যেরূপ মহাপ্রাণ ছিলেন তেমনই নির্ভীক ছিলেন। তাঁর জন্মভূমির প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুরক্তি ছিল। তিনি দেশের জন্য জীবন দান করেছিলেন। তিনি অপরিসীম শক্তিশালী দলগুলিকেও সংযত রেখেছিলেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও ধৈর্যের প্রভাবেই তিনি তাঁর দলকে শক্তিশালী করেছিলেন। এই অপরিসীম উদ্যমের জন্যই তাঁকে জীবন দান করতে হ'ল। 'এই স্বেচ্ছার ত্যাগ—অতি মহান।'[১]

দেশপ্রেম ও দেশসেবার এই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং দেশবন্ধুর অসামান্য ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েই ত' নৃপেন্দ্রচন্দ্র ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশসেবার কণ্টকময় পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। তারপর দেশবন্ধু যখন অহিংস অসহযোগ নীতি বর্জন ক'রে স্বরাজ্য দল গঠন করলেন সেদিন তাঁর প্রিয় নেতার

১। The Forward, June 19, 1925

সঙ্গে গান্ধীপন্থী নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল। বাঙ্গলার রাজনীতি তখন নতুন খাতে বইতে আরম্ভ করেছে। নো-চেঞ্জার নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সেখানে কোন স্থান ছিল না এবং সম্ভবত সেই কারণেই তিনি রাজনীতিক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে ব্রহ্মদেশে সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। সেখানকার জাতীয়তাবাদী পত্রিকা রেঙ্গুন মেইলের সম্পাদক হিসাবে সেই সুদূর প্রবাসে স্বীয় প্রতিভা ও চরিত্রবলে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারপর একটি নতুন পত্রিকা স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন করেন এবং হয়ত তাঁর পরিকল্পিত 'দি বার্মা ক্রনিকল' ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেই বাস্তবে রূপায়িত হ'ত এবং সেই পত্রিকার কর্ণধাররূপে হয়ত তাঁকে রেঙ্গুনেই বসবাস করতে হ'ত। কিন্তু তাঁর জীবনবিধাতার অভিপ্রায় ছিল স্বতন্ত্র। তাই আমরা দেখতে পাই যে দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিকল্পনাকে শুরুতেই বর্জন ক'রে তিনি বাঙ্গলায় ফিরে এলেন; প্রবেশ করলেন নতুন ক'রে এখানকার রাজনীতিতে।

দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছিল সত্য, কিন্তু তাই ব'লে সেই সর্বত্যাগী রাজবৈরাগীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কোনও দিনই হারান নি। শ্রদ্ধা যে হারান নি তারই নিদর্শন হিসাবে দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরে দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড পত্রিকার একটি বিশেষ স্মারক সংখ্যায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি ছত্র এখানে উৎকলিত ক'রে দিলাম: 'To write about Deshbandhu, our departed guide is a task of supreme difficulty —specially for those of us who have been amongst his staunchest comrades in the grim Swaraj struggle, which at the present moment appears to be regaining much of its original momentum. It is difficult in this case to avoid the errors of the personal equation, to repress the natural surge of overpowering emotion and adequately to correct the blurred perspectives of a too close proximity. It is easier to praise than to appraise a superman of such astounding calibre. Blind worship comes handier in such instances than clear-eyed appreciation··· Later on we have agreed to differ and differed to agree. It was not possible for me on conscientious grounds to join the Swarajist banner that he unfurled with the new cry of

capturing the bureaucratic citadels and fighting the enemy inside his own enclosures; so long, at least as he was alive. While he was fighting his battles and triumphing over enormous odds by the sheer force of a magnetic personality and a tremendous will force, destiny took me away to fight the same battle in another, humbler way in that distant province of Burma···May the free spirit of Deshbandhu Das chasten us all—bind us, unite us, heal our wounds, dry up our tears and make of warring factions and parties again a serried phalanx of God's soldiers, devoted to Light, to Freedom and above all to Truth.[১]

কিন্তু এহো বাহ্য। দেশবন্ধুর ত্যাগ ও প্রেমে পরিশুদ্ধ জীবন নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল যে তিনি তাঁর মহান নেতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আর একটি শ্রদ্ধাঞ্জলিতে লিখেছিলেন: 'The tears for the Deshbandhu, the country's devoted friend and the refuge of the poor, the depressed, the oppressed, are not yet dry in an admiring and mourning people's eyes and to write about him without passion or prejudice, understatement or overstatement is hard indeed. And yet as one who suffered and fought alongside of that Big Soul fought for his innermost ideas and idealisms even when outwardly to fight against certain modes and passing phases of his life, I make bold to say that there was hardly a greater man born in Bengal in the plane of activity after Sree Chaitanya. For Chittaranjan had in him the makings of a modern Chaitanya from the start···It was given to him to *love greatly* and those who love greatly suffer greatly also. This was the kingly dower, the royal largesse with which the Divine Lover had blest him; this is the heritage he has left us'.[২]

১। *Prophets and Patriots*: N. C. Banerjee.

২। তদেব।

এইখানে নৃপেন্দ্রচন্দ্র দেশবন্ধুর যে উত্তরাধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাঙলায় এই উত্তরাধিকার বহনের যোগ্য নেতার অভাব ঘটেছিল, একথা আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলতে পারি। আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে আমরা যখন দেশবন্ধুর নেতৃত্বের মূল্যায়ন করব তখন আমরা এই কথাই বলব যে এমন মহোত্তম জীবন-বিন্যাস রাজনীতিক্ষেত্রে আগে ত' নয়ই, পরেও আমরা আর দেখলাম না। তাঁর নেতৃত্বের পিছনে ছিল একটা গভীর আদর্শবাদ। সেই আদর্শের ভিত্তি ছিল নবীন জাতীয়তাবাদ যার প্রবক্তা ও প্রচারক ছিলেন তিলক—বিপিনচন্দ্র—অরবিন্দ। ধর্মভিত্তিক এই জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবাদ থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। এইটাই চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা ও উৎস। তাই না তিনি অত অল্প সময়ের মধ্যে আনতে পেরেছিলেন দেশজোড়া অমন একটা কর্মপ্লাবন ও ভাবোন্মাদনা অর্থাৎ dynamism ও emotional integration—যার তুলনা ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে বিরল বললেই হয়। সম্ভবত এই একটি কারণেই তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অমন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা গান্ধীজী স্বয়ং স্বীকার করেছেন। শুধু কি কর্মপ্লাবন বা ভাবোন্মাদনা? না, তা নয়। সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ হাতে তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি বিরাট সংগঠন, কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যা ছিল তখনও পর্যন্ত কল্পনাতীত। পুঞ্জীভূত ভাব নিয়ে ইতিহাসে এক এক যুগে এক একটা আদর্শ দেখা দেয়। কিন্তু সেই আদর্শ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এক একজন নেতার কর্মশক্তির মধ্যে। তাঁর সময়ে দেশবন্ধু ছিলেন এমনই একজন শক্তিমান নেতা।

নেতা তিনিই যিনি অনুভব করতে পারেন ইতিহাসের প্রাণস্পন্দন আর যাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয় বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত। দেশবন্ধু ছিলেন এই শ্রেণীর নেতা। আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার কৌশলটা তাঁর আয়ত্ত ছিল ব'লেই না তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে তিনি বিপুল কর্মের আবর্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নেতার আবির্ভাব ঘটে ইতিহাসের প্রয়োজনে। সেই প্রয়োজনকে সৃষ্টি করে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী। সে নেতৃত্বের জয়রথ ছুটে চলে বিরামহীন, আপোষহীন সংগ্রামের পথে—পথের সকল বাধাবিঘ্নকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে। যে পটভূমি, পরিপার্শ্ব ও ঐতিহ্য থেকে দেশবন্ধুর আবির্ভাব ঘটেছিল তার বিস্তারিত আলোচনায় প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ইতিহাসের এক সঙ্কটকালে দেশবন্ধু ছিলেন জাতির সেই প্রত্যাশিত নেতা,

যাঁর কর্মসাধনায় রাজনীতি পেয়েছিল একটা নতুন ব্যঞ্জনা আর আমাদের জাতীয় জীবনের মরা গাঙে দুকূল প্লাবিত ক'রে ডেকে উঠেছিল কোটালের বান। পরিপূর্ণ নেতৃত্ব বলতে ঠিক যা বোঝায় দেশবন্ধুর মধ্যে আমরা তাই প্রত্যক্ষ করেছি। এই নেতৃত্বের সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। প্রকৃত দেশসেবক ছিলেন ব'লেই না তিনি হতে পেরেছিলেন একজন যথার্থ দেশনেতা। এইখানেই তাঁর নেতৃত্বের গূঢ় রহস্য। সমকালীন নেতাদের মধ্যে সম্ভবত দেশবন্ধুই একমাত্র নেতা ছিলেন যিনি তাঁর নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ছিলেন বিশেষভাবেই সচেতন ও সতর্ক। এই নেতৃত্বের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: 'বাঙ্গলায় কৌশলের সঙ্গে দূরদর্শিতার সমবায় একমাত্র চিত্তরঞ্জনে দেখা গিয়েছে।'

দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গলার রাজনীতিতে একটা বিরাট শূন্যতা দেখা গিয়েছিল। রাজনৈতিক সঙ্কটকালে এমন একজন ক্রান্তদর্শী রাজনীতিজ্ঞ নেতার অভাবে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী সেদিন সত্যিই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা তখন একটা যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিল। সন্ধিক্ষণ বলছি এই কারণে যে অসহযোগিতার রাজনীতি তখন সহযোগিতার পথে মোড় নিতে উদ্যত হয়েছে। এমনটা যে ঘটবে, সে ভবিষ্যদ্বাণী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ করেছিলেন, বিপিনচন্দ্রও করেছিলেন। মৃত্যুর মাত্র ছয় সপ্তাহকাল পূর্বে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার মধ্যে সহযোগিতার সুর বেশ স্পষ্টভাবেই ধ্বনিত হয়েছিল। সেই স্মরণীয় সম্মেলনে স্বয়ং গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। যে সহযোগিতার কথা তিনি সেদিন সেখানে বলেছিলেন তা অবশ্য ছিল দেশবন্ধুর নিজের কথায়, 'honourable co-operation' বা সম্মানজনক সহযোগিতা।

দেশবন্ধুর জীবিতকালেই অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের আপাত নিষ্ফলতা লক্ষ্য ক'রে বাঙ্গলার বিপ্লবীরা সেই সময়ে ঐ আন্দোলনের প্রতি তাঁদের আস্থা হারিয়েছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা নবপর্যায়ে তাঁদের বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস শুরু করেন। এরই প্রথম প্রয়াস ছিল তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা। এর পরেই একদিন লর্ড লিটনের সঙ্গে দেশবন্ধুর এক সাক্ষাৎকার ঘটে ও তারপর তিনি সকল রকম হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যের নিন্দা ক'রে প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দিলেন। এই পটভূমিকাতেই ফরিদপুর সম্মেলনে সভাপতির

ভাষণের মধ্যে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যেন একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাঁর কণ্ঠে সেদিন শোনা গিয়েছিল সহযোগিতার সুর—সম্মানজনক সহযোগিতা। সকলেই বুঝলেন যে, তিনি সরকারের সঙ্গে একটা আপোষরফায় আসবার জন্য ব্যগ্র হয়েই সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন। বিপ্লবীরা তাঁর এই মত পরিবর্তন সমর্থন করলেন না, বরং তাঁরা এর নিন্দাই করলেন। এর অল্পকাল পরেই দেশবন্ধুর মৃত্যু হয় এবং তখন ভারত সচিব বার্কেনহেড অথবা ভারত সরকার কেউই আর কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে অগ্রসর হলেন না। দমননীতি তখনও সমান ভাবেই চলছিল।

এই অবস্থায় সকলের মনে প্রশ্ন জাগল—কে এখন বাঙ্গলা পরিচালিত করবেন? সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় কারাগারে, দেশবন্ধুর একান্ত অনুগামী ও বিশিষ্ট কর্মীদের সকলেই তখন আটক বন্দী হয়ে বিভিন্ন কারায় আবদ্ধ ছিলেন। অর্ডিনান্স আইনের বলে এঁরা সকলেই ধৃত হয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিনা বিচারে বন্দীজীবন যাপন করেছিলেন। এসব ঘটনা দেশবন্ধুর জীবিত কালেই ঘটেছিল এবং এঁদের অভাবে তাঁর যেন তখন ভগ্নপক্ষ জটায়ুর অবস্থা হয়েছিল বললেই হয়। বাঙ্গলাকে এখন নেতৃত্ব দেবেন কে?—এই প্রশ্নটি সেদিন তাই বিশেষভাবেই দেখা দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী তখন পর্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান ক'রে বাঙ্গলার রাজনৈতিক শূন্যতার অবস্থা নিয়ে গভীরভাবেই চিন্তা করতে থাকেন এবং নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তখন যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার রাজনীতিতে প্রধানত এই তিনটি বিষয়ে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল, যথা—(১) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ; (২) বাঙ্গলার স্বরাজ্য দলের সভাপতির পদ এবং (৩) কলিকাতা পৌরসভার পৌর-প্রধানের (মেয়র) পদ। তাঁর জীবিতকালে তিনি একাই এই তিনটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—দেশবন্ধুই ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, স্বরাজ্য দলের সভাপতি ও পৌরসভার পৌরপ্রধান। এই তিনটি দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে পারেন এমন যোগ্যতা সেদিন একজনের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাই সকলের দৃষ্টি, বিশেষ ক'রে গান্ধীজীর দৃষ্টি তাঁরই উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি দেশবন্ধুর পাশে এসে তাঁর শিষ্য ও সহকর্মীরূপে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিষদীয়

াজনীতিতেও তিনি আইন সভায় তাঁর প্রিয় নেতার সঙ্গে একত্রে কাজ রেছেন। তাঁর কর্মশক্তি, সংগঠনী প্রতিভা, বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্ব যতীন্দ্রমোহনকে দশবন্ধুর অনেকখানি নিকটে টেনে এনেছিল বলা চলে। দেশসেবায় তাঁর াগও বড়ো সামান্য ছিল না। দেশপ্রিয়ই এখন দেশবন্ধুর যোগ্য রাজনৈতিক ত্তরাধিকারী—এই কথা যখন গান্ধীজী বাঙ্গলার নেতৃস্থানীয়দের কাছে বললেন খন সকলেই এক বাক্যে তাঁকে সমর্থন করলেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর বারো দিন পরে (২৮ জুন, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গীয় স্বরাজ্য লের একটি বিশেষ অধিবেশনে যতীন্দ্রমোহন সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভাপতি র্বাচিত হলেন। প্রদেশ কংগ্রেসে তিনি তখন সহকারী সভাপতি ছিলেন। ভাপতির মৃত্যুতে যদিও স্বাভাবিক ভাবে তাঁরই সভাপতির পদ লাভের কথা, তথাপি গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে যতীন্দ্রমোহন নির্বাচনের ভিতর দিয়ে আসাই াঞ্ছনীয় মনে করলেন। পরের দিন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনে বনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যতীন্দ্রমোহন সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সেদিন স্বরাজ্য লের মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাঁকে 'Hail the Leader'—হে জননায়ক, স্বাগতম্ ব'লে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। মেয়রের পদটি তিনি অবশ্য বিনা বাধায় লাভ করতে পারেননি। গান্ধীজীর সুপারিশক্রমেই তিনি পৌরপ্রধানরূপে নির্বাচিত হন ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই। সেদিন এই মেয়র নির্বাচন বিষয়টিকে কেন্দ্র ক'রে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এইভাবে সেদিন দেশপ্রিয়ের মস্তকে একে একে গৌরবের ত্রিমুকুট সংস্থাপিত হয়েছিল।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন রেঙ্গুন থেকে কলিকাতায় ফিরলেন তখন তিনি এসে দেখলেন যে বাঙ্গলার রাজনীতিতে শুরু হয়েছে এক নতুন অধ্যায় এবং নেতারূপে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি তাঁরই সহকর্মী ও বন্ধু যতীন্দ্রমোহন। এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মচরিতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন: ''জুলাই মাসে যেইমাত্র আমি কলিকাতায় ফিরে এলাম, তখনি আমি আমার পুরাতন বন্ধু ও সতীর্থ জে. এম. সেনগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তাঁর মস্তকে গৌরবের ত্রিমুকুট ন্যস্ত হয়েছে। তিনি প্রীতিভরে অভ্যর্থনা করলেন এবং বাঙ্গলার সেই অবস্থায় আমার প্রত্যাবর্তন যে সময়োচিত হয়েছে সে কথাও বললেন। আমাদের সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় কিরণশঙ্কর রায়ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দুজনেই আমার ফিরে আসার জন্য সুখী হয়েছিলেন। আমাকে তৎক্ষণাৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে গ্রহণ করা হয়।'

কিন্তু কংগ্রেসের উৎসাহ-উদ্দীপনায় তখন রীতিমত ভাটা পড়েছে, এটা তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। তাঁর কলিকাতায় আগমনের অল্প কিছুদিন পরে এই বিষয়টি নিয়ে নেতাদের মধ্যে এক ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা হয়। এই বৈঠক বসেছিল দেশবন্ধুর বাসভবনে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন গান্ধীজী ও সরোজিনী নাইডু। নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। সেই বৈঠকে যখন বার্কেনহেডের আপোষপ্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হয় তখন একমাত্র নৃপেন্দ্রচন্দ্রই দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—'Let us not lower the flag on any account'. তাঁর মুখে এই কথা শুনে গান্ধীজী হেসে বলেছিলেন: The same old mad man'. এটা পরোক্ষে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের দেশপ্রেমেরই প্রশস্তিবাক্য। গান্ধীজীর এই উক্তির উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'হ্যাঁ আমিই সেই পাগল। ভারতীয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে ব্রহ্মদেশের নিরুত্তাপ পরিবেশের মধ্যে দু'বছর কাটিয়েও আমার পাগলামি সারেনি।' এইভাবেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র সেদিন নতুন ক'রে বাঙ্গলার রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন।

রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন

প্রথম পর্ব

'১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন ক'রে আমি দেখলাম যে কংগ্রেসের তখন ভাটার অবস্থা চলেছে।' কলিকাতায় ফিরে আসার অব্যবহিত পরে সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মনে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তিনি কর্মীপুরুষ, তাই তাঁর পক্ষে নিশ্চেষ্টভাবে ব'সে থাকা অসম্ভব ছিল। বেরিয়ে পড়লেন ঐ বছরের শেষভাগে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে। ফিরে আসার পর তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির যে কয়টা অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন তাতে তাঁর মনে বাঙ্গলায় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও এর সংহতি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ জেগে উঠেছিল এবং জেলাগুলিতে সংগঠনের কাজ কি রকম চলছে সেটা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য তিনি যে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সেটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাঁর উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন:

'আমি কয়েকটি প্রধান প্রধান শহর এবং গ্রামে গ্রামে কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন

করলাম। সর্বত্রই দেখলাম যে সংগঠনযন্ত্রে যেন মরিচা ধরেছে; উৎসাহের অভাব, নেতৃত্বের অভাব। এর ব্যতিক্রম ছিল রংপুর জেলার গাইবান্ধা। এই ক্ষুদ্র শহরটির সঙ্গে আমার স্কুল জীবনের বহু স্মৃতি বিজড়িত ছিল। দেখলাম তরুণ কংগ্রেস কর্মীদের চেষ্টায় এখানে স্থাপিত হয়েছে একটি পাঠাগার ('তিলক লাইব্রেরি') ও রীডিং রুম। একটি ছোটখাট খেলাধূলার আখড়াও স্থাপিত হয়েছে। একজন বহিরাগত যুবক—অনুজা সেনগুপ্ত—গাইবান্ধার তরুণ কংগ্রেস কর্মীদের নেতা ছিলেন। পরিচয়ের পর থেকেই তিনি আমার খুব অনুগত হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমে আমি জানতে পারি যে তিনি একটি বিপ্লবী দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর যেমন ছিল সংগঠন শক্তি তেমনি চমৎকার ছিল তরুণদের উপর প্রভাব।···দেখলাম কংগ্রেসের গ্রামীণ কেন্দ্রগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয় এবং অনেক জায়গায় এর কোন অস্তিত্বই ছিল না। আবার কোথায়ও কোথায়ও ছিল ভুয়া সংগঠন। একজন কংগ্রেস নেতাকে (ইনি ১৯২১ সালের স্বরাজ ও খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন) দেখলাম তখন বিলাতি কাপড় প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং এটা যে জাতীয়তা বিরোধী কাজ, সেটা তাঁর যেন আদৌ মনে হয় নি। উত্তরবঙ্গ সফর শেষ ক'রে কলিকাতায় ফিরে আমি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে সব কথা জানালাম।'

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল কানপুরে। এবারকার কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন সরোজিনী নাইডু। বাঙ্গলা থেকে অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কানপুর কংগ্রেসে যোগদান করেন ও ব্রহ্মদেশের অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি যখন রেঙ্গুনে ছিলেন তখনই দেখে এসেছিলেন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য কর্মীদের মধ্যে প্রবল মনোভাব এবং তিনি নিজেই 'রেঙ্গুন মেইল' পত্রিকায় এই নিয়ে কত সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সামনে এত সব জরুরী বিষয় ছিল যে, ভারত ব্রহ্মদেশ বিষয়টি সম্পর্কে অথবা ব্রহ্মদেশে অবস্থিত ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করবার অবসর ছিল না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হ'ল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সভাপতিত্ব করেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর বিবেচনায় এই অধিবেশন নিতান্তই নিরুত্তাপ ছিল। 'শাসমল একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের তুল্য নেতৃত্বসুলভ গুণের অভাব ছিল তাঁর মধ্যে।' শাসমলের সঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অকাল মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। তথাপি শাসমল সম্পর্কে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের এই মন্তব্যের

হেতু বুঝতে হ'লে কৃষ্ণনগর সম্মেলনের ইতিহাসটা এখানে সংক্ষেপে একটু উল্লে করা দরকার।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন বসল কৃষ্ণনগরে মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। শতযুদ্ধের বিজয়ী বীর তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী। যতীন্দ্রমোহনের মতো তিনিও ছিলেন একজন কৃতবিদ্য ব্যারিস্টার গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে মেদিনীপুর যে বাঙ্গলার মানচিত্রে সগৌরবে ভেসে উঠেছিল তার মূলে ছিল বীরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত সংগঠনী শক্তি। কৃষ্ণনগর সম্মেলনের সভাপতির গৌরব তাঁর প্রাপ্য ছিল। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই সভাপতির মুদ্রিত অভিভাষণটির কিছু বিলি হয়েছিল। শাসমলের অভিভাষণের মধ্যে বাঙ্গলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে বিরূপ কটাক্ষ ছিল। তিনি বলেছিলেন, যাঁরা মনেপ্রাণে বিপ্লবী ও যাঁরা অহিংসায় বিশ্বাসী নন তাঁদের পক্ষে কংগ্রেসের সভ্য হওয়া সঙ্গত নয়, কারণ কংগ্রেস হ'ল স্বাধীনতালাভের জন্য কেবলমাত্র অহিংস কর্মীদের প্রতিষ্ঠান শাসমলের এই অভিমত সভায় দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল ও সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁর ভাষণ থেকে এই অংশটুকুর অপসারণ দাবী করলেন। তিনি তখন বললেন, এ তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত এবং সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে এমন কথা বলবার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে। প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বিপ্লবী ছিলেন ; তাঁরা কিছুতেই শাসমলের এই উক্তি মেনে নিতে পারলেন না এবং বললেন, যদি ইহা প্রত্যাহৃত না হয়, তাহলে তাঁরা সভা পণ্ড ক'রে দেবেন।

যতীন্দ্রমোহন, কিরণশঙ্কর, নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন তখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বাইরে থেকে এসেছিলেন সরোজিনী নাইডু; তিনি তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তাঁরা সকলেই দুই দলের মধ্যে একটা মীমাংসার চেষ্টা করলেন। শাসমল তখন তাঁর ভাষণ থেকে বিপ্লবীদের সম্পর্কিত ঐ অংশটুকু বাদ দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু ভাষণটি পাঠ করবার সময় যেই মাত্র তিনি বললেন যে, যদিও আপত্তিকর অংশটুকু তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত তথাপি এটা তাঁকে বাদ দিতে বলা হয়েছে, অমনি সভায় দেখা দিল তুমুল চাঞ্চল্য এবং সভাপতিকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। শাসমল তখন বললেন, যেহেতু নির্বাচিত সভাপতির উপর সভ্যদের বিশ্বাস নেই, সেইহেতু তিনি পদত্যাগ করছেন। এই বলে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে, তাঁর জেলার প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে

গিয়ে বসেন। তখন যতীন্দ্রমোহন ও সরোজিনী নাইডুর বিশেষ অনুরোধে শাসমল মঞ্চে প্রত্যাবর্তন করেন ও ভাষণটি পাঠ করেন। কিন্তু তাঁর ভাষণ শেষ হওয়ার আগেই সভায় এমন তুমুল বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল যে, সরোজিনী নাইডু উত্তেজিত শ্রোতাদের শান্ত হবার জন্য অনুরোধ করে ব্যর্থকাম হন। পরের দিন বিষয় নির্বাচনী সভায় বিরোধীদল শাসমলের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এবং তাঁর পরিবর্তে অপর একজনকে কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই শাসমলের রাজনৈতিক জীবনের ওপর যবনিকা নেমে এসেছিল।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কাছে এই প্রাদেশিক সম্মিলন এইজন্যই নিরুত্তাপ মনে হয়েছিল। কিন্তু বাঙ্গলার সমকালীন রাজনীতিতে কৃষ্ণনগর সম্মেলন যে কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে তার কোন উল্লেখ করেন নি। এখান থেকেই যে দলীয় ভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয় তা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত এরই পরিণতি সুভাষ-সেনগুপ্ত বিরোধে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্পর্কে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কিছু বলেন নি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত হিন্দু-মুসলিম চুক্তি ঐ প্রস্তাবে বর্জিত হয়। দেশপ্রিয় ছিলেন দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলিম চুক্তির একজন উৎসাহী সমর্থক। তাই দেখা যায় কৃষ্ণনগর ঘটনার পরেই ১৩ই জুন তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির একটি বিশেষ সভা ডাকেন। সভা ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সভ্যদের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি পত্রে সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন: 'Let me make it clear to you that in spite of the Hindu-Muslim trouble the Hindu-Muslim Pact of 1925 has to be maintained and the B.P.C.C. cannot reject it'. কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য তখন এই চুক্তি ধ্বংস করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের এই বিশেষ সভা সেদিন যতীন্দ্রমোহনের রাজনৈতিক জীবনেও দিক্-পরিবর্তন সূচিত করে দিয়েছিল এবং তখন থেকে প্রদেশ কংগ্রেস তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই তিনটি দলের মধ্যে প্রথমটি ছিল সেনগুপ্ত সমর্থক, দ্বিতীয়টি সেনগুপ্ত-বিরোধী ও তৃতীয় দলটি ছিল নিরপেক্ষ। শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন ললিতমোহন দাস।

প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনীতিতে এই অনৈক্য, কলহ ও বিরোধ নৃপেন্দ্রচন্দ্র

* এই গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণনগর সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং সমগ্র ঘটনাটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

পর্যবেক্ষণ ক'রে গভীরভাবে ব্যথিত হলেন। তাঁর মতো আদর্শবাদী পরিবর্তন বিরোধীদের স্থান তখন প্রদেশ কংগ্রেসে সঙ্কুচিত হ'লেও, তাঁর চরিত্র-মাধুর্য নিরভিমান ব্যক্তিত্ব তাঁকে সকল দলের কাছেই প্রিয় ক'রে তুলেছিল। বস্তুত বাঙ্গলার রাজনীতিতে সুভাষ-সেনগুপ্ত বিরোধের যে কলঙ্কিত ইতিহাস, সেই ইতিহাস যেদিন সম্পূর্ণভাবে, সত্যভাবে লিখিত হবে সেদিন আমরা জানতে পার যে, একমাত্র নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই দুই নেতার মধ্যে সেতুস্বরূপ কাজ করেছিলেন। এর কারণ যতীন্দ্রমোহন তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই আর পরবর্তীকালে তরুণ সুভাষচন্দ্র যখন দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ ক'রে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হয়েছিলেন তখন থেকে তিনি তাঁর দেশপ্রেম ও চরিত্র-মাধুর্যে তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে বৈদ্যবাটীতে অবসর জীবন যাপন করছেন, তখনও দেখা গিয়েছে যে সুভাষচন্দ্রের অন্তঃকরণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তাই প্রদেশ কংগ্রেসের সেই সঙ্কটকালে এই দুই নেতার মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র সেতুস্বরূপ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এটা বড়ো কম গৌরবের কথা নয়।

রেঙ্গুন থেকে বাঙ্গলায় প্রত্যাবর্তনের পর অভয় আশ্রমগোষ্ঠী ও খাদি প্রতিষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ তাঁদের সাংগঠনিক কাজে যোগদানের জন্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে আহ্বান করেছিলে এবং কৃষ্ণনগর সম্মেলনে তিনি যখন যোগদান করতে এসেছিলেন তখন সুরেশচ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে পুনরায় অনুরূপ অনুরোধ করেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দেশের কাজে যোগদানের অব্যবহিত পরে চট্টগ্রামে নৃপেন্দ্রচ "সারস্বত আশ্রম" নামে যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছিলেন তার থেকেই বৃহত্ত কার্যক্রম নিয়ে কুমিল্লায় স্থাপিত হয়েছিল অভয় আশ্রম। চট্টগ্রামে খদ্দর খদ্দরবস্ত্রকে জনপ্রিয় করবার মূলে সারস্বত আশ্রমের অবদান ছিল। আচা প্রফুল্লচন্দ্র সারস্বত আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও এই প্রতিষ্ঠানটির কাজে খুব প্রশংসা করতেন তিনি। ১৯২২ থেকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ—এই তিন বছরকা রাজনৈতিক কর্মব্যপদেশে, নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে চট্টগ্রামের বাইরে থাকতে হয়েছিল। এ সময়ে তাঁর অনুরাগীরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্থানীয় ভদ্রলোকদের সক্রিয় সাহায্যে সারস্বত আশ্রমকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আশ্রমের কেন্দ্র তখন শহর থেকে সুচিয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সমগ্র বঙ্গে এইটিই খা উৎপাদনের বৃহত্তম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ

সময়ে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যসূচির মধ্যে খদ্দর-প্রচার একটা বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছিল। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'খাদি প্রতিষ্ঠান' একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল এবং তাঁরই অনুরোধক্রমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন।

অতঃপর আমরা নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে দু'মাসের জন্য খাদি প্রচারে ব্যাপৃত থাকতে দেখি; এই সময়ে তিনি বহু জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ খাদি কেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং সর্বত্র আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করতেন; তাঁর সঙ্গে কিছুসংখ্যক খাদি-বিক্রেতা থাকত আর থাকত খদ্দরবস্ত্র। এইভাবে বক্তৃতার সঙ্গে বিক্রয়ের কাজটাও চলত। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান ও বীরভূম আর পূর্ববঙ্গে নোয়াখালি, শ্রীহট্ট ও অন্যান্য ব্যবসাকেন্দ্র তাঁর ভ্রমণ-সূচীর অন্তর্গত ছিল। এইসব স্থানে তাঁর পূর্ব-পরিচিতদের সঙ্গে নতুন ক'রে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন: 'সর্বত্র খাদিকে জনপ্রিয় ক'রে তোলা হয় এবং সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে খদ্দরবস্ত্র বিক্রী হয়েছিল। আমার বক্তৃতার মধ্যে উত্তেজনা থাকত—থাকত বৈপ্লবিক চিন্তা; তাই স্বভাবত আমার এইসব বক্তৃতা পাঠ ক'রে সতীশবাবু আতঙ্কিত হলেন। তিনি তখন একমাত্র গঠনমূলক কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তা'ছাড়া তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন অহিংসায় বিশ্বাসী। এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়; তখন আমি খাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করি। তখন আমার মনে হয়েছিল যে, বাঙ্গলার কোন একটা বড় কলেজে আমি যদি অধ্যাপকরূপে যোগদান করতে পারি তাহলে ছাত্রসমাজের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পারব এবং কংগ্রেসের পক্ষে সেটা ভালই হবে।'

১৯২৬। জুন মাস। তাঁর ছাত্র, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর মাধ্যমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাঁদের খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা হয় এবং সম্মানজনক সর্তেই তিনি ঐ কলেজে সিনিয়র অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন। বহুদিন পরে অধ্যাপনার জগতে প্রত্যাবর্তন, আমরা অনুমান করতে পারি, নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনে যেমন মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল, তেমনিই এনে দিয়েছিল আর্থিক সচ্ছলতা। ১৯২৬-এর জুলাই থেকেই তিনি বঙ্গবাসী কলেজে যোগদান করেন এবং তখন থেকে একাদিক্রমে সাড়ে সাত বছরকাল তিনি এই শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মতো একজন বিপজ্জনক রাজনৈতিক মানুষকে তাঁর কলেজে স্থান দিয়ে অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন সেদিন।

সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রতি আমরা এইবার একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ

করতে পারি। মনে রাখতে হবে, সরকারি কলেজের উচ্চ বেতনের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করার সময় থেকে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে উঠেছিল রাজনীতি—কংগ্রেসীয় রাজনীতি কিন্তু রাজনীতিতে তিনি বিশেষ কোন দলভুক্ত ছিলেন না। তিনি বরাবরই ছিলেন স্বাধীন মতাবলম্বী। তাইতো তিনি একই সঙ্গে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে পারতেন—অহিংসার রাজনীতি ও হিংসার রাজনীতি—যদিও, তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত তিনি ছিলেন না। কিন্তু ঐ দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, তখন বাঙ্গলার বৈপ্লবিক শক্তি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আবার রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। যেহেতু তিনি একজন স্বাধীন মতাবলম্বী কংগ্রেসী ছিলেন, সেইজন্য কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বাম উভয় শিবিরেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হ'তো। এই সময় থেকেই প্রাদেশিক কংগ্রেসে তরুণ কর্মীদের প্রাধান্য সূচিত হতে দেখা গিয়েছিল—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক তরুণ ও তরুণী যোগদান করতে থাকে। এরা সবাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই এসেছিল এবং এরা যে অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের নীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করবে, আপন দূরদৃষ্টিবলে নৃপেন্দ্রচন্দ্র সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। যুগে যুগে নতুনের কাছে পুরাতনকে পথ ছেড়ে দিতে হয়—এই সত্যটা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের রহস্যটা তো এইখানেই আর এটা বুঝতে না পারলে তাঁর জীবনানুশীলন বৃথা।

১৯২৭। তখন থেকে তরুণদের বহু অন্বেষিত নেতা হয়ে উঠলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। তরুণদের আয়োজিত ও বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সভা সমিতিতে তিনি আবার বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। সকলের কাছে তখন থেকে তিনি 'মাষ্টারমশাই' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। 'তখনকার প্রত্যেক রাজনৈতিক সভার আকর্ষণই ছিল মাষ্টারমহাশয়ের বক্তৃতা'—সেই সময়কার একজন বিখ্যাত বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীর মুখে লেখক এই কথা শুনেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ধুবরিতে (আসাম) অনুষ্ঠিত সম্মেলনটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি একটি বৃহৎ সম্মেলন ছিল এবং এর সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে। এ ছাড়া কখনও যতীন্দ্রমোহন আবার কখনও বা সুভাষচন্দ্রের সমভিব্যাহারে, কখনও একত্রে দু'জনের সঙ্গে তিনি ফরিদপুর, ঢাকা

চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি, বরিশাল, মৈমনসিংহ এবং উত্তরবঙ্গের বড় বড় শহরে অনুষ্ঠিত বহু রাজনৈতিক সভায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন।

অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহপাঠী মিলে এই কলেজে 'রবীন্দ্র-পরিষদ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা স্থাপন করেন। রবীন্দ্র-অনুরাগীদের অনেকেই তখন কলেজের মধ্যে এসে মিলিত হতেন; ক্রমে এখানে প্রধানত কবির রচনাবলীকে কেন্দ্র ক'রে একটি পাঠচক্র গড়ে উঠেছিল। অনেক সময়ে কবি স্বয়ং ছাত্রদের অনুরোধে এখানে এসে ভাষণ দিতেন ও আবৃত্তি করতেন। এই উপলক্ষেই তাঁর পুরাতন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সংযোগ আবার স্থাপিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্র-পরিষদের প্রায় অনুষ্ঠানেই তিনি নিমন্ত্রিত হতেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, একজন প্রচণ্ড ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী তাঁর পুরাতন কলেজেই তাঁর ভাবধারা প্রচারের সুযোগ পেয়েছিলেন সেদিন। তাঁর অধ্যাপক-জীবনের প্রথমভাগে রবীন্দ্রভক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র যেমন ক্লাসে বক্তৃতা দেবার সময় ইংরেজী কবিতার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা ক'রে, রবীন্দ্র-কবিতাকে জনপ্রিয় ক'রে তুলবার প্রয়াস পেয়েছিলেন (এ প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে), তেমনই তাঁরই সুযোগ্য পুত্র তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদ স্থাপন ক'রে একটা বড় কাজই করেছিলেন বলতে হবে। কিন্তু যাক সে কথা; আমরা প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলির ওপর নৃপেন্দ্রচন্দ্রের প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদী নারীসংঘগুলির মধ্যে। ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি অনেক নেতার ঈর্ষার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তিনি তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিরও একজন সদস্য। তাই সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য বিপুল জনসমাবেশ হ'ত। যদিও তখন সুভাষ-সেনগুপ্তের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের ফলে তাঁর পথ খুব সুগম ছিল না, তথাপি নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই দুই নেতার পারস্পরিক বিবাদ থেকে দূরে অবস্থান ক'রে তাঁদের উভয়কেই সমানভাবে সাহায্য করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর মতের সংঘর্ষ না বেধেছে। অন্যদিকে সরকারের পক্ষে নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে নিয়ে কম মুস্কিল হয়নি। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন: 'I was one of the most uncompromising

critics of administrative lapses or un-British ways and I alwa steered a middle path between nonviolence and violence. T Government could never place me in any fixed category.· was often a mystery man in politics.'

আসল কথা, রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করার সময় থেকে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং এইজন্যই যত দিন তিনি রাজনীতিতে ছিলেন তত দিন স্বাধীনভাবেই ক করেছেন, কোন একটি দলের বা কোন একজন নেতার অনুগামী তিনি হ পারেন নি। এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে একটা বিশিষ্টতা প্রদ করেছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন কর সক্ষম হয়েছিলেন। দলীয় রাজনীতির বহু উর্ধ্বে অবস্থান করে, স্বাধীনতা সংগ্রা তাঁর মতো আর কাউকে অংশ গ্রহণ করতে আমরা দেখিনি। স্পষ্ট বক্তা ছিে নৃপেন্দ্রচন্দ্র এবং এইজন্য অনেকের কাছে তিনি ছিলেন সেদিনকার রাজনী ক্ষেত্রের একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ও একজন আপোষবিরোধী রাজনৈতি কর্মীপুরুষ।

এই সময়ে লর্ড আরউইন ছিলেন ভারতের বড়লাট। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হব আগেই পার্লামেন্টের নির্দেশে তিনি একটি কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করে ইহাই সাইমন কমিশন। গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবর্গ এই কমিশন সম্পর্কে বিশেষ কে উৎসাহ বোধ করেন নি। এই কমিশনের সদস্য হিসাবে কোন ভারতীয়কে গ্র করা হয় নি। স্যার জন সাইমন ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি। ১৯১৯ খ্রীষ্টা এদেশে যে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল তা কতদূর সফল লাভ করেছে এবং শাসনব্যবস্থায় ভারতবাসীর হাতে আরও অধিক ক্ষমতা দেও যায় কিনা—এই দুটি বিষয় পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যই এই কমিশন প্রেরি হয়েছিল। দশবছর আগেকার নতুন শাসনতন্ত্র কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করেছি তাই কংগ্রেস থেকে সাইমন কমিশনকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিতই ছি তা ছাড়া, দেশে তখন দ্বৈতশাসনের সমাধি ঘটেছে, কাজেই এমন অবস্থ পার্লামেণ্টারী কমিশনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। এই পটভূমিকাতেই অনুষ্ঠি হয় মাদ্রাজ কংগ্রেস (১৯২৭) খ্রীষ্টাব্দ। নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই কংগ্রেসে উপস্থিত থে রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনার পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করেছিলেন। কংগ্রেসের নির্দে সেদিনকার ভারতের চারিপ্রান্তে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল সহস্রকণ্ঠে

সাইমন কমিশন ফিরে যাও'। এখানে উল্লেখ্য যে, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে সেদিন দেশব্যাপী যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে বাঙ্গলায় সর্বপ্রধান অংশ গ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র। তিনি তখন হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ক'রে সবেমাত্র ইয়ুরোপ থেকে ফিরেছেন। বাঙ্গলার এই আন্দোলনে আমরা নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে উৎসাহের সঙ্গেই শামিল হতে দেখি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সাইমন কমিশন বর্জন উপলক্ষ্যে ভারতের সর্বত্রই ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কিন্তু বিক্ষোভ চরমভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল লাহোরে। সেখানে এক বিরাট জনতার (সে জনতা সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল) পুরোভাগে ছিলেন পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়। এক ইংরেজ পুলিশ সার্জেন্টের বেটনের আঘাত লাগে লাজপত রায়ের বুকে। মারাত্মক সেই আঘাতের ফলে সতেরো দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার ফলে সেদিন সমগ্র ভারত যেরকম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তার তুলনা কংগ্রেসের ইতিহাসে বিরল বললেই হয়।

সাইমন কমিশনের সফল বর্জন কংগ্রেসের ভাবমূর্তিকে আবার নতুন ক'রে জনসাধারণের সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরল। এই পটভূমিকাতেই ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশন বসল। সুখের বিষয়, এই সময়ে বাঙ্গলার নেতৃস্থানীয়দের সকলেই একযোগে কংগ্রেসের এই অধিবেশন যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে 'আটাশ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেস নানাভাবেই স্মরণীয় হয়ে আছে। সভাপতি—মতিলাল নেহরু; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন; সাধারণ সম্পাদক—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়; প্রদর্শনী সম্পাদক—নলিনীরঞ্জন সরকার আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক—সুভাষচন্দ্র বসু। এছাড়া, নেতৃস্থানীয় আরও অনেকেই কোন না কোনরূপ দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে কংগ্রেসের এই অধিবেশনকে এমনভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন যা প্রত্যক্ষ ক'রে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন।

বাঙ্গলার বিপ্লবীরা নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং প্রদেশ কংগ্রেসে তখন তাদের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। 'তাঁরা তাই চাইলেন যে কলিকাতা কংগ্রেসে আমি যেন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করি। এর ফলে অভ্যর্থনা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মিলনের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলাম। সুভাষচন্দ্র এই সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন। দায়িত্বপূর্ণ এই পদে নির্বাচিত হওয়ার পর আমি যখন একজন দক্ষ সচিবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম, তখন আমার বিপ্লবী বন্ধু রমেশচন্দ্র আচার্য এই কাজের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।'

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল—পূর্ণ স্বাধীনতা, না ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। গান্ধীজী তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং বাঙ্গলার প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে একাধিক আলোচনা বৈঠক বসেছিল। সে সব আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বিশদ ছিল। এইসব বৈঠকে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যোগদান করতেন। 'আমার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত না করে আমি কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও বিভিন্ন দলের অভিমত খুব মনোযোগ সহকারে শুনতাম। বাঙ্গলার বিপ্লবীরা 'স্বাধীনতার' স্বপক্ষে ছিলেন এবং এবিষয়ে তাঁরা আমার সমর্থনের উপরে নির্ভর করতেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেনগুপ্ত ও তাঁর অনুগামীরা যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দেবেন, এটা একরকম অবধারিত ছিল ; অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর অনুগামীরা ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে উপলক্ষ্য ক'রে পিতা ও পুত্র—মতিলাল ও জওহরলাল—বিপরীত শিবিরে অবস্থান করেছিলেন।'

এমন অবস্থায় ভোটাভুটির সময় নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দেন তখন বাঙ্গলার চরমপন্থী তরুণদল যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। 'আমার বেশ মনে আছে যে, ভোটাভুটির পর কংগ্রেস-মণ্ডপেই একদল তরুণ অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাদেরকে বলতে হ'লো যে আমি কখনও আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কাজ করি না। আমার সুনিশ্চিত ধারণা, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ভারত তার অস্তিত্ব রাখার মতো যোগ্যতা এখনও পর্যন্ত লাভ করে নি।' সস্তা জনপ্রিয়তা নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে যে কোনদিন প্রলুব্ধ করতে পারে নি, এটি তারই একটি দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত তাঁর রাজনৈতিক জীবনে আরো অনেক আছে।

এই কংগ্রেসে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল সেটি উত্থাপন করেন সর্দার শার্দুল সিং কবিশের আর সেনগুপ্তের অনুরোধক্রমে প্রস্তাবটি সমর্থন করেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। এই স্মরণীয় প্রস্তাবটি সমর্থন করতে উঠে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তিনি যখন অকম্পিতকণ্ঠে বলেছিলেন : "If this sort of killing of leaders by Government agents continued, our Congress volunteers if and when the Congress so ordered, would not only know how to die but also to kill." তখন সমবেত লক্ষ দর্শকের করতালি বজ্রাবে সম্বর্ধিত করেছিল। কয়েকমাস পরে এজন্য তাঁকে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের

আদালতে রাজদ্রোহ অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রক্সবার্গ তখন ছিলেন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তখন একাধিক রাজনৈতিক মামলার শুনানী তাঁরই এজলাসে হ'ত। বিচারে নৃপেন্দ্রচন্দ্র দোষী সাব্যস্ত হলেন কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে মাত্র ভৎর্সনা ক'রে রেহাই দিলেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নি অথবা সরকার পক্ষের সাক্ষীদেরও জেরা করেন নি। রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েও আদালতে দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন না করা একজন যথার্থ গান্ধীবাদীর লক্ষণ। এইখানে একটি ঘটনা উল্লেখ্য। প্রস্তাবটি সমর্থন ক'রে তিনি যখন বক্তৃতামঞ্চ থেকে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে স্থান পরিগ্রহ করেন তখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী তাঁকে বলেছিলেন: প্রোফেসর ব্যানার্জী, আপনি তাহলে আর অহিংসায় বিশ্বাসী নন! এর উত্তরে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, "সত্যি কথা বলতে কি, বাঙ্গলায় এখন কেউই আর অহিংসায় বিশ্বাস করে না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমরা আপনাদের কমবেশি আটবছর সময় দিয়েছি।" আপনাদের ব্যবস্থানুযায়ী আজ পর্যন্ত আপনারা কি সাফল্য লাভ করেছেন! বলা বাহুল্য, নৃপেন্দ্রচন্দ্রের এই বলিষ্ঠ উত্তর বাঙ্গলারই উত্তর ছিল এবং বাঙ্গলার যে কোন সুযোগ্য নেতা যে এই অভিমতই পোষণ করেন এটা সেদিন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মনেপ্রাণে একজন নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী হওয়া সত্ত্বেও, কংগ্রেসের এই অধিবেশনকে সার্কাসের সামিল বলে গান্ধীজীর বিরূপ মন্তব্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র আদৌ বরদাস্ত করতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে গঠিত ও শিক্ষিত সেচ্ছাসেবক বাহিনীর আধা-সামরিক রূপটি পর্যন্ত গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বিসদৃশ মনে হয়েছিল; কিন্তু ঐ সংগঠনের ফলে এক নূতন বিপ্লব প্রচেষ্টার সুরু।

কংগ্রেসের এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে একটি নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস সংগঠিত হয়। ইউসুফ মেহেরালী, বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এই সংস্থার গঠনতন্ত্র রচনা করেন। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ জননেতা কে. এফ. নরিম্যান এই যুব কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন এবং এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র একটি চাঞ্চল্যকর বক্তৃতা প্রদান করেন। যাঁরা রাজনীতি থেকে পলায়ন ক'রে অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্ন আছেন তাঁদের প্রতি কটাক্ষ ছিল তাঁর এই বক্তৃতায়। এই ক্ষেত্রে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শের মধ্যে নিবিড় ঐক্য ছিল। 'অধ্যাত্মবাদের প্রকৃত মর্ম আমার কাছে চিরদিনই রহস্যময় মনে হয়েছে'—এই কথা বলেছেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র।

রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন

দ্বিতীয় পর্ব

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে বাঙ্গলার রাজনীতিতে যে দলীয় কলহ ও বিরোধের সূচনা হয় তা ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনকে উপলক্ষ্য ক'রে দানা বেঁধে উঠল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে এই সম্পর্কে একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তখন বাঙ্গলার বিপ্লবীরা দুটি দলে বিভক্ত ছিলেন—যুগান্তর ও অনুশীলন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বলেছেন, বাঙ্গলার বৈপ্লবিক সংগঠনকে দুর্বল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ইংরেজের গোয়েন্দা পুলিশ এদের মধ্যে বিভেদ-বৈষম্যের বীজ বপন ক'রে দিয়েছিল যার ফলে এই দুটি দলকে সর্বদাই বিবদমান দেখা গিয়েছে। এদের মধ্যে যুগান্তর দলের সভ্যরা সমর্থন করত সুভাষচন্দ্রকে আর অনুশীলন দল ছিল একান্তভাবেই যতীন্দ্রমোহনের সমর্থক। যুগান্তর দলের সভ্যগণ নৃপেন্দ্রচন্দ্র সম্পর্কে যেরকম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, অন্যদিকে অনুশীলন ঠিক তার বিপরীত আচরণ পোষণ করতেন তাঁর সম্পর্কে। বিপ্লবী দলের মধ্যে এই পারস্পরিক বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সেদিন বাঙ্গলার রাজনৈতিক অগ্রগতি সত্যিই রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

এ ছাড়া স্বরাজ্যদল কর্তৃক অধিকৃত পৌরসভার মেয়রের পদটিও দলীয় রাজনীতির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পদটিকে উপলক্ষ্য করেই সেদিন প্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের কলহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশবন্ধুর পর মেয়রের পদে দেশপ্রিয়ের উপর্যুপরি পাঁচবার নির্বাচন দলীয় রাজনীতিকে সেদিন তীব্রতর ক'রে তুলেছিল। প্রদেশ রাজনীতির ঠিক এই পটভূমিতেই কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। শুধু বাঙ্গলার রাজনীতিতে নয়, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে দুই দলের—গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী—শক্তির পরীক্ষাও দেখা গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল এই দুই তরুণ দেশপ্রেমিককে কেন্দ্র ক'রেই সেদিন কংগ্রেসে বামপন্থীদের অভ্যুদয় দেখা গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের ইউসুফ মেহেরালীর নামও উল্লেখ্য। কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সামরিক মূর্তি গান্ধীজীর মোটেই ভাল লাগেনি এবং তিনি যে বিধিবদ্ধ অহিংসানীতির বিরুদ্ধে তরুণ বাঙ্গলার বিদ্রোহ আশঙ্কা করেছিলেন, সে কথা নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্পষ্টভাবেই তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বয়ং একজন পুরোদস্তুর গান্ধীবাদী হয়েও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। তাঁর আত্মচরিতে

গান্ধীজী ও স্বভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। তিনি লিখেছেন :

'The reactions of Gandhiji to the semi-military dispositions of Subhas Bose at Calcutta were not very happy, nor very happily expressed. Gandhiji sensed the imminent revolt of young Bengal against the cult of non-violence : he might have also sensed the growing prestige and influence of Bose amongst youth all over India. And no wonder Subhas began to cast his spell all about him.···His life from a boy has been one continuous *Sadhana* and dedication to one and only one idea—the Freedom of India ; and people who have criticised him and his ways in the bungling mazes of the Calcutta Corporation or in the broader twisted passages of the Congress organisation have known only the outside and never penetrated into the holy of holies--the dedicated sanctuary of a noble soul. Subhas has been a realist of realists : he has never tied himself down to a simple formula or a rigid doctrine. So he has advanced slowly but with sure and farm steps on his path—the path which only free souls baptised in the founts of revolutionary zeal and trained for any sacrifice for the cause can tread.'

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হ'ল, কিন্তু স্বভাষচন্দ্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রকৃতি তাঁরই সমকালীন একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক সতীর্থের দৃষ্টিতে সেদিন যেভাবে প্রতিভাত হয়েছিল তা যে একজন দূরদ্রষ্টার উক্তি ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ যখন সর্বভারতীয় কংগ্রেসী রাজনীতিতে বাঙ্গালীর নেতৃত্ব বলতে কিছুই নেই, তখন এই জন্ম-বিদ্রোহী নেতার প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক ব'লে বিবেচিত হতে পারে। কলিকাতা কংগ্রেসের পটভূমিকায় বাঙ্গলার বহুধা-বিভক্ত বিপ্লবী দলগুলি সম্পর্কেও নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মন্তব্য বাস্তবতাবর্জিত নয়। তিনি এই প্রসঙ্গে যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তিনি বলেছেন যে, কংগ্রেসকে ধূম্র-আবরণী হিসাবে ব্যবহার করে, বিপ্লবীদলগুলির মধ্যে এই সময়ে যেরকম ভাঙাগড়া চলছিল তার ফলে বিপ্লবীদের সংহতি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। যুগান্তর ও অনুশীলন—এই দুটি প্রধান দল

এই সময়ে নানা গোষ্ঠীতে যথা—চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল, মৈমনসিং, ফরিদপুর, নোয়াখালি, মেদিনীপুর গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এইসব বিভিন্ন বিপ্লবীগোষ্ঠী থেকেই পরবর্তীকালে উদ্ভূত হয়েছিল কংগ্রেস, সোস্তালিস্ট, কম্যুনিষ্ট, রায়পন্থী বিপ্লবী সোস্তালিস্ট, ভারতের বলশেভিক প্রভৃতি একাধিক দল। এইসব দলগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা যেমন ছিল না, তেমনই ছিল প্রস্তুতির অভাব। বাঙ্গলার এই অধীর বিপ্লবী শক্তি সম্পর্কে সতর্ক হয়েই গান্ধীজী তাঁর পরবর্তী কার্যসূচী—ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন গ্রহণ করেন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বাঙ্গলায় যেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্যোগ আয়োজন হতে থাকে। সভাসমিতি, সম্মেলন এবং ছাত্র ও মহিলাদের বিরাট সমাবেশে বাঙ্গলার রাজনৈতিক পরিবেশ এই সময়ে খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। '১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আমার জীবন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ছিল। এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে—কখনও একাকী, আবার কখনও বা সেনগুপ্ত অথবা সুভাষের সঙ্গে একাধিক রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান করতে হ'ত। কলেজে, ছাত্রাবাসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কি শ্রমিকদের মধ্যে তরুণ বাঙ্গলার উত্তেজনা ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছিল। এই বছরে ফরিদপুর জেলার নরিয়া গ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মিলন হয়। যতীন্দ্রমোহন এই সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন এবং এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি এই সম্মিলনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলাম। এই সম্মিলনীতে বহুসংখ্যক মুসলমান যোগদান করেছিল। এদের উপর ডাক্তার ব্যানার্জীর বিশেষ প্রভাব ছিল। এদের উপস্থিতি থেকে সেদিন এই সত্যটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, বাঙ্গলার হাজার হাজার মুসলমান কংগ্রেসের আদর্শের অনুগামী।'

তিনি যখন নরিয়া সম্মিলনীতে মঞ্চের উপর দেশপ্রিয়ের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন সেই সময়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক কিরণশঙ্কর রায়ের কাছ থেকে একটি তারবার্তা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের হাতে এসে পৌছল। ঐ তারবার্তায় তাঁকে এই মর্মে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, মাণিকগঞ্জে আসন্ন ঢাকা জিলা কংগ্রেস সম্মিলনীতে তিনি যেন সভাপতিত্ব করেন। 'আমি তখন এই বিষয়ে সেনগুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি আমাকে সম্মত হতে বলেন। এইরকম সম্মান আমি চিরকাল বর্জন ক'রে এসেছি, তাই প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদকের এই অনুরোধ রক্ষা করতে আমি কুণ্ঠাবোধ না করে পারিনি। ইতিপূর্বে (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে) এই সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেছিলেন দেশবন্ধু এবং তাঁর উত্তরাধিকার লাভ করতে আমি নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত বোধ করেছিলাম।'

স্বাধীনতা সংগ্রামে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ঐকান্তিক উৎসাহ ও কর্মশক্তি এবং কংগ্রেস আদর্শের প্রতি তাঁর তনুমননিবেদিত আনুগত্যের কথা আজ যখন আমরা স্মরণ করি তখন আমাদের মনে হয় এই সম্মান সর্বাংশেই তাঁর প্রাপ্য ছিল। নরিয়া থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ক'রে তিনি সভাপতির ভাষণ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ভাষণটি তিনি বাংলাতেই রচনা করেছিলেন। এই অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজনৈতিক ভাবমূর্তি বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তিনি তখন একজন পুরোদস্তুর গান্ধী-বিরোধী বললেই হয়। তথাপি সম্মিলনের মঞ্চ থেকে সভাপতি হিসাবে বিপিনচন্দ্রকে বাঙ্গলার অন্যতম রাজনৈতিক গুরু ব'লে পরিচয় দিতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। '১৯০৫ সালে তাঁর মতো আর কেউ আমাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ক'রে, স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করেন নি।' নৃপেন্দ্রচন্দ্রের এই উক্তি তাঁর মহত্ত্বেরই পরিচায়ক ছিল।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মাণিকগঞ্জ ভাষণের মূল সুর ছিল—আসন্ন বিপ্লবের জন্য দেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে সংহতিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, চিন্তাযোগ্য ও গঠনমূলক এবং কার্যকরী নির্দেশপুষ্ট এই ভাষণটির প্রশংসা সেদিন দলমতনির্বিশেষে সকলেই করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সম্মিলনী বাঙ্গলার স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনে একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেছিল এবং সম্মিলনে উপস্থিত তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন একটি কংগ্রেস পতাকা তুলে দিয়েছিলেন তখন সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি উঠেছিল। 'তোমরা এই পতাকার সম্মান তুলে ধরবে এবং প্রয়োজন হ'লে এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না'—এই কথা বলেছিলেন তিনি। এই পতাকা উপহার অনুষ্ঠানে অনুশীলন দলপতি ও নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বন্ধু প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীও একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেছিলেন। বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার বিষয় ছিল বৈষ্ণব সাহিত্য।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল রংপুরে আসন্ন প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তিন জনের মধ্যে—জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। একসময় রংপুর তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। এখানে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছিল এবং রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল সুবিদিত। তাই নৃপেন্দ্রচন্দ্র আশা করেছিলেন যে, এই ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি জয়লাভ করবেন। কিন্তু নবোদিত সূর্যের মতো তখন

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয় দেশবাসীর মনপ্রাণ আকর্ষণ করেছিল। কাজেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষপর্যন্ত তিনিই জয়লাভ করেন। রংপুর প্রাদেশিক সম্মিলনে উপস্থিত গণ্যমান্যদের মধ্যে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুভাষচন্দ্র এঁদের দুজনেরই খুব প্রিয় ছিলেন। ঠিক ছিল যে, গান্ধীজী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। কিন্তু তিনি আসতে না পারায়, অভ্যর্থনা সমিতির অনুরোধক্রমে নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে এই পবিত্র কার্যটি সমাধা করতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র, সেনগুপ্ত ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র—তিন জনেই রংপুরে একত্রে গিয়েছিলেন ও রেল স্টেশনে পৌঁছানোর পর তাঁরা বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তার বিশেষ একটি কারণ ছিল। তিনিই তখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদে আসীন ছিলেন আর সম্পাদক হিসাবে কিরণশঙ্কর তখন তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হয়ে উঠেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব লাভ ক'রে সুভাষচন্দ্র তখন কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন। তখন থেকেই বাঙ্গলার দুই জনপ্রিয় নেতার মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত। কিন্তু পৌরসভায় দেশপ্রিয়ের জনপ্রিয়তা তখনও পর্যন্ত কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি তার প্রমাণ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মেয়র নির্বাচনের ফলাফল। সে বছর এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র পরাজিত হন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মেয়র নির্বাচনের সময়ে যতীন্দ্রমোহনের জনপ্রিয়তা নতুন ক'রে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রদেশ রাজনীতিতে, বিশেষ করে তাঁর নিজস্ব জেলায় তাঁর ভাবমূর্তিটা যে ঠিক পূর্বের ন্যায় উজ্জল ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের চট্টগ্রাম জিলা সম্মিলনীতে।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই চট্টগ্রামে জিলা সম্মেলনের অধিবেশন হওয়ার কথা প্রচারিত হ'ল। জিলা কংগ্রেসের সভাপতি তখন ছিলেন যতীন্দ্রমোহন, কিন্তু প্রকৃত কর্তৃত্ব তখন ছিল যুবকদের হাতে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্যকুমার সেন (মাস্টারদা) ছিলেন তখন জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আর কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রমুখ। এঁরাই সম্মিলনে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কলিকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে সুভাষচন্দ্র তখন দেশের যুবসম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বাঙ্গলার এই

বিপ্লবকেন্দ্রে সেদিন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত তিনটি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল—প্রথম, সুভাষচন্দ্রের, সভাপতিত্বে রাজনৈতিক সম্মিলন; দ্বিতীয়, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে যুব সম্মিলন আর তৃতয়টি ছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সভাপতিত্বে ছাত্র সম্মিলন। চট্টগ্রাম জিলা সম্মিলন প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন যে, এক প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লোকনাথ বল ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান—যুব সম্মিলন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড অধিবেশনের মণ্ডপ থেকেই জ্যোতিষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে বিচারার্থ চুঁচুড়ায় নিয়ে যায়। তিনি তখন চুঁচুড়া দেশবন্ধু স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর ভাষণের মধ্যে এই আজন্ম বিপ্লবী যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও ত্যাগের মন্ত্র চট্টগ্রামের যুবকদের দিয়ে গিয়েছিলেন তা বিফল হয়নি। কারণ আমরা দেখতে পাই যে যুব সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ অল্পদিনের মধ্যেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের মতো একটা সারা ভারত-কাঁপানো কাণ্ড ক'রে বসেন। প্রসঙ্গত জ্যোতিষচন্দ্র সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলছি। বাঙ্গলার ছাত্র তথা যুব সমাজে ইনি 'মাস্টার মশাই' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম। ভারতের বিপ্লব ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন কী আশ্চর্য মানুষই না ছিলেন তিনি! আজীবন ব্রহ্মচারী সাত্ত্বিক পুরুষ, মুখে সুগভীর প্রসন্নতার শান্ত দীপ্তি, কর্মে অনলস, কর্তব্যে অটল, পাণ্ডিত্যে অসাধারণ এবং ঔদার্যে সীমাহীন। বাঙ্গলার যুবশক্তির অন্তরলোকের সুপ্ত আত্মার জাগরণ দিনে মাস্টার মশাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন নেতৃত্ব নিয়ে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ প্রাচীন গুরুর মতো। তাঁরই ইঙ্গিতে একাধিক বাঙ্গালি তরুণ মৃত্যুবরণ করেছিলেন জীবনীশক্তির পূর্ণ বিকাশে, স্বদেশপ্রেমের অদ্ভুত চাঞ্চল্যে। এই শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে জীবনের অর্ধশতাব্দী কালেরও অধিক তিনি দেশজননীর সেবায় ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। রাজশক্তির অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন তাঁকে কোন দিন দমিত করতে পারে নি। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাতাশী বছর বয়সে এই বিপ্লবীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে আসার পর নৃপেন্দ্রচন্দ্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন সভা সম্মিলনে তাঁর ভাষণ সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর বিরুদ্ধে এই সময়ে কম-বেশি পাঁচটি রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল—তিনটি কলিকাতা ও আলিপুরে, একটি যশোহরে ও অপরটি ঢাকায়। একবার দেশবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে হাজরা পার্কে একটি জনসভার আয়োজন হয়। কলিকাতার তদানীন্তন

পুলিশ কমিশনার স্যর চার্লস টেগার্ট তখন এই মর্মে একটি আদেশ জারী করেন যে সভায় যোগদানকারীরা শোভাযাত্রা সহকারে যেতে পারবেন, কিন্তু কেউ সঙ্গে ক'রে লাঠি নিতে পারবেন না। 'কলকাতার কংগ্রেস নেতারা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে চাইলেন না। হাজরা পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় আমি কংগ্রেস সংগঠকদের এই ভাবে নতিস্বীকার করার তীব্র নিন্দা করেছিলাম। আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম, যখন কোথাও শান্তিভঙ্গের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই তখন দেশবন্ধুর মতো একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর সম্মানে আয়োজিত শোভাযাত্রার ব্যাপারে শহরের প্রধান কনস্টেবলের সামনে কাপুরুষতা প্রদর্শনের কোন যুক্তি থাকতে পারে না।'

এই বক্তৃতার জন্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। আদালতে তাঁর পক্ষ সমর্থন করে দাঁড়িয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। বিচারে তাঁর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ঐ একই সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবার্গের এজলাসে আরও দুটি রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং বিচারে তিনি একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। এই দুটি দণ্ডাদেশ ও আগেকার দণ্ড একসঙ্গেই চলেছিল। যশোহরের কালিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত জিলা সম্মিলনে যোগদান করতে গিয়ে তিনি যে বক্তৃতা করেন সেজন্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ নিয়ে আসা হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধানদের মধ্যে প্রায় সকলেই—সুভাষচন্দ্র বসু, জ্যোতিষ ঘোষ, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও অন্যান্য প্রবীণ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র এই সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। এইখানে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন: 'যদি আপনারা সত্যিই কংগ্রেসের আদর্শে দেশের সেবা করতে চান তাহলে এই সম্মিলনীতে যিনি সভাপতিত্ব করছেন সেই সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। যদি সংগ্রাম ক'রে স্বরাজ ছিনিয়ে আনতে হয়, তারও একটি উজ্জ্বল ও মহিমময় দৃষ্টান্ত আপনারা পাবেন যতীন মুখার্জির মধ্যে যিনি সংগ্রাম করতে করতে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন।'

এই বক্তৃতার জন্য যশোহরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার লারকিনের এজলাসে নৃপেন্দ্রচন্দ্র অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার ক'রে এখানে বিচারার্থ নিয়ে আসা হয়। বিচারে তাঁর ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং রক্সবার্গ প্রদত্ত দণ্ডের সঙ্গে এই দণ্ড একই সঙ্গে চলবে ব'লে ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই কালিয়া সম্মেলনে এমন একজন দেশপ্রেমিকার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় যিনি পরবর্তীকালে তাঁর পরিবারের একজন হয়ে

গিয়েছিলেন। তাঁর নাম সুহাসিনী গাঙ্গুলী। বাঙ্গলার স্বাধীনতাব্রতী যুবসমাজে ইনিই সেদিন 'মেজদি' বলে পরিচিত ছিলেন। দেশের কাজে এই বীরাঙ্গনা তুলনাহীন সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ দীর্ঘ নয় বৎসরকাল অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পলাতক বিপ্লবীদের ইনিই ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের একটি বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের মান-সম্ভ্রম বিপন্ন হতে পারে জেনেও। এ ঘটনা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। তাঁরই প্রদত্ত বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, দুঃসাহসী এই দেশপ্রেমিকদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য সুহাসিনী কলিকাতায় মূকবধির বিদ্যালয়ের ভাল চাকরী পরিত্যাগ করেছিলেন এবং চন্দননগরে একটি স্কুলে অপেক্ষাকৃত কম বেতনের একটি চাকরী গ্রহণ করেছিলেন। চন্দননগরের একজন উচ্চস্তরের বিপ্লবীর সহায়তায় তিনি একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে সেখানে অতিথি হিসাবে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সুহাসিনী নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন ; তাঁর পুত্র-কন্যারা তাঁকে পিসীমা বলে ডাকতেন।

১৯৩০। এপ্রিল মাস। আচম্বিতে ভারতের এক প্রান্তে চট্টগ্রামে একদিন রাতে বিপ্লবের বিষাণ বেজে উঠল। বিদেশী শাসকের শক্তির প্রতীক সেখানকার সুরক্ষিত অস্ত্রাগারটি অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সেই ইতিহাস আজ সুবিদিত। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও দেশপ্রিয় দুজনেই আলিপুর কারাগারে। 'আমরা জেলের মধ্যে লুকিয়ে আনা স্টেটসম্যান পত্রিকার স্তম্ভে এই সংবাদ পাঠ করি এবং জেলে আমার কয়েকজন সতীর্থ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। আমি কিন্তু অতটা হইনি। তাঁদের আমি বলেছিলাম, ঠিক বা অন্যায় হোক, ওরা কৃতকার্য হোক বা অকৃতকার্য হোক বাংলার বিপ্লবীরা যে আজও মরেনি—এই ঘটনা তারই একটি জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন।'

গান্ধীজী যখন অস্পৃশ্যদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন তার তরঙ্গ পূর্ববঙ্গে ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ শহরে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। মুন্সীগঞ্জে জনসাধারণের চাঁদায় একটি মন্দির তৈরী হয়েছিল, কিন্তু সেখানে স্থানীয় নমশূদ্র ও অন্যান্য হীন জাতির নর-নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না। তারা মন্দিরের ভিতরে গিয়ে পূজা দিতে পারত না। এমন কি তারা মন্দিরের চত্বরের মধ্যে পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারত না। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে

সেই সময় মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত নমশূদ্রদের একটি সভায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে শহরে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই নিয়ে সেখানে একটি ছোটখাট আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল বললেই হয়। হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দ তাঁর কিছুসংখ্যক কর্মী নিয়ে ঐ সময় মুন্সীগঞ্জে উপস্থিত হয়েছিলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের একজন বড় কর্তা সেখানে উপস্থিত হন এক তরুণ বাঙ্গালী ছিলেন মুন্সীগঞ্জের সাবডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে কলিকাতায় ফিরে যেতে বলেন। উত্তরে তিনি বলেন যে যে উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন তা সফল না করে তিনি ফিরবেন না। তিনি আরও বলেছিলেন যে, পুলিশ উস্কানি না দিলে এই ব্যাপারে শান্তি বা শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার কোন হেতু নেই।

শেষপর্যন্ত পুলিশের লাঠিতে বেশ কিছুসংখ্যক লোক (যারা মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল) আহত হয় এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্র মজুমদার সহ নৃপেন্দ্রচন্দ্র গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২৯ সালের শেষভাগে বিচারের পূর্বেই মুন্সীগঞ্জের কারাগার থেকে তাঁকে আলিপুর কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯৩০। লবণ আইনকে উপলক্ষ করে শুরু হয় গান্ধীজীর আইন-অমান্য আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বৎসরটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে আন্দোলনের বছর হিসাবে। আইন-অমান্য আন্দোলনের তরঙ্গ যেন শতধারায় সেদিন প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল ভারতের সর্বত্র—শহর জনপদ, গ্রাম—সর্বত্রই জনসাধারণ কংগ্রেসের নির্দেশে এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। এই আন্দোলনের সাফল্য পূর্বেকার অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা অনেক বেশি, অনেক ব্যাপক ছিল। গান্ধীজী তাঁর ঊনাশী জন অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে দাণ্ডী যাত্রা করেন লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য। সেই সংবাদ যখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে তখন জনসাধারণের মনে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশের নেতারাও তাঁদের আন্দোলন শুরু করেন। তার আগে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলিকাতায় পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের সংঘর্ষে সুভাষচন্দ্র গুরুতরভাবে আহত হন। তিনি তখন পৌরসভার প্রধান ছিলেন। বাঙ্গলায় লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁর সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানে। এখানে সব জায়গায় নিষিদ্ধ

লবণ তৈরী করা সম্ভব ছিল না। তখন নেতারা অন্যান্য আইনভঙ্গের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তবে বাঙ্গলায় যেসব স্থান সমুদ্রের উপকূলবর্তী, যেমন মেদিনীপুর, ডায়মণ্ডহারবার, চট্টগ্রাম প্রভৃতি, সে সব স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনের সময় নৃপেন্দ্রচন্দ্র কারাগারে ছিলেন; তাই তিনি এতে কোন অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানকারী নেতারা যখন ধৃত ও দণ্ডিত হলেন তখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল তাঁদের সমাগমে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠলো। এই সময়ে কারাগারের মধ্যে একদিন একটি জাতীয় পতাকা উত্তোলন ক'রে নৃপেন্দ্রচন্দ্র এক অসম-সাহসিকতার কাজ করেছিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন সারা ভারতবর্ষেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি প্রদেশের কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাঁদের অনুচরবৃন্দসহ ধৃত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই টভূমিকায় বিলাতে প্রথম পর্যায়ের চক্র-বৈঠক যখন ব্যর্থ হয় তখন শুরু হয় গান্ধী-আরউইন আলোচনা। লর্ড আরউইন তখন ভারতের বড়লাট। এই সাক্ষাৎকারের সময় রাজপ্রতিনিধি ও গান্ধীজীর মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। একদিকে দেশের মধ্যে চলছে আইন অমান্য আন্দোলন ও সরকারি দমননীতি আর অন্যদিকে রাজধানী দিল্লীতে বড়লাট-ভবনে চলছে গান্ধীজীর সঙ্গে আরউইনের কুড়িদিনব্যাপী আলোচনা। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের ফলাফল গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই চুক্তিই সেদিনকার রাজনীতিতে একটা বড় রকমের দিক্-পরিবর্তন সূচিত করে দিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না; বরং সমসাময়িক রাজনীতি অথবা রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা এই প্রসিদ্ধ চুক্তিদ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল।

লাটভবনে স্বাক্ষরিত হ'ল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। এই চুক্তির শর্তাবলী প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস-পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়। দণ্ডিত নেতৃবর্গ ও সত্যাগ্রহী সকলেই মুক্তি পেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই চুক্তিতেই ঠিক হয়েছিল যে, কংগ্রেস পক্ষ থেকে গান্ধী লণ্ডনের চক্র-বৈঠকে যোগদান করবেন। ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কতখানি দেওয়া যায়, এই বৈঠকে সেটাই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বাঙ্গলার তৎকালীন বহু বিশিষ্ট নেতার সমাগম হয়েছিল রাজবন্দীরূপে, যে কথা আগেই উল্লিখিত

হয়েছে। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের সোমদত্ত নামে একজন পাঞ্জাবী ছিলে৷ এই কারার অধ্যক্ষ। তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের বেশ সম্ভাব ছিল সাধারণ কয়েদীদের কারাগারের মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষা দেবার জন্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র তখন কারামন্ত্রী। তিনি সেই পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেছিলেন। এইভাবে দশ-বারোটি সাধারণ কয়েদীকে নিয়ে শুরু হয় কারাগারের মধ্যে পাঠশালা। বই, শ্লেট প্রভৃতি সরকার থেকেই সরবরাহ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন যে, কারাগারের এই বিচিত্র পাঠশালায় তাঁর অনুরোধে সুভাষচন্দ্র কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কারাগারের মধ্যে যে অপ্রীতিকর ও মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি নৃপেন্দ্রচন্দ্রের আত্মচরিত থেকে আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম।

'জেলের মধ্যে গোয়েন্দার অভাব ছিল না। জেলের ভেতরে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন, কয়েদীদের লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া এবং আরও ছোটখাটো কয়েকটি ঘটনা কোন সূত্রে সরকারের দৃষ্টিতে আনা হয়ে থাকবে। কারণ, হঠাৎ একদিন জেল-সুপার নিজমূর্তি ধারণ করলেন; স্কুল বন্ধ করে দিলেন এবং আমাদের সতীর্থদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি শান্তশিষ্ট বলে পরিচিত ছিলেন এবং যিনি ঠিক আমার ওয়ার্ডের পাশের সেলটিতে থাকতেন তাঁকে স্থানান্তরিত করে একটি শাস্তি সেলের মধ্যে রাখা হয়। এঁর নাম সর্দার বলবন্ত সিং—ইনি একজন শিখ পুরোহিত ছিলেন। কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল যে, তিনি নাকি একটি সার্জেন্ট ও কয়েকজন ওয়ার্ডারের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছিলেন। এটা কিন্তু একেবারেই অবিশ্বাস্য ছিল—একটি ধাপ্পা বললেই চলে। আমরা কেউই এ অভিযোগ মেনে নিতে পারলাম না। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলো এবং ঠিক হলো, সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হবে যে, সর্দারজীকে তাঁর পূর্বতন ওয়ার্ডে এবং সেলের মধ্যে স্থানান্তরিত করা না হলে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁরা লক-আপে যেতে সম্মত হবেন না। সোমদত্ত ছিলেন একজন সামরিক বিভাগের আই. এম. এস.; কংগ্রেসীদের সংহতি সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না, এমন কি যেসব দেশপ্রেমিকের তত্ত্বাবধায়ক তিনি ছিলেন তাঁদের সম্ভ্রম ও প্রভাব সম্পর্কে অথবা বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে ভদ্রলোকের কোন ধারণা ছিল না। নোটিশ পাওয়ার পর সুপার ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হলেন এবং 'পাগলাঘন্টি' বাজাবার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সার্জেন্টসহ জেল ওয়ার্ডারর

লাঠি হাতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল ও অপমানসূচক কথা বলতে লাগল। তারা ভুলে গিয়েছিল যে, রাজবন্দীদের মধ্যে কলিকাতা পৌরসভার প্রধান রয়েছেন।[১] সোমদত্ত আমাদের অত্যন্ত কর্কশভাবে সেলের মধ্যে ফিরে যেতে বললেন এবং আরও বললেন যে, তিনি আমাদের এই বিদ্রোহ বরদাস্ত করবেন না। আমি তখন তাঁকে বলতে বাধ্য হলাম যে, কলিকাতার মেয়রের সামনে তিনি যেন ভদ্র আচরণ করেন। সুপার আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন ও আমাদের মারবার জন্য ওয়ার্ডারদের হুকুম দিলেন। এদের অনেকের উপরেই আমার ব্যক্তিগত প্রভাব ছিল—তাদের প্রায় প্রত্যেকেই আমাকে জানত ও মাস্টার মশাই বলে সম্মান করত। চুপিসারে তাদের আমি বললাম তারা যেন শূন্যে লাঠি ঘোরায়। এইভাবে কিছুক্ষণ বাধা দেবার পর একজন ওয়ার্ডার আমার নির্দেশ অনুসারে জোর করে আমার হাত ধরে আমাকে সেলের মধ্যে নিয়ে যায় ও তখন অন্যান্য সকলে সেলে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু একজন এলেন না। তিনি হলেন আমাদের নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে এক পা'ও নড়েন নি। তখন একজন কি দুজন সার্জেন্ট তাঁর কাছে এসে ধাক্কা মেরে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয় ও তাদের সঙ্গে তাঁর কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়, ফলে তিনি অল্পক্ষণের জন্য অচৈতন্য হয়ে পড়েন।'

এই ঘটনার প্রতিবাদে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কারাগারের মধ্যে অনশন শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই অনশনের ফলেই সরকার সুপার সোমদত্তকে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর পরেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে ঢাকা কারাগারে বদলী করা হয়েছিল। এইখানে তিনি তাঁর কারা-সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু অধ্যাপক জোতিষচন্দ্র ঘোষকে। ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ঢাকা কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৩১ সালের শেষভাগে করাচী কংগ্রেসে তিনি যোগদান করেন। করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই গুরুত্বের হেতু ছিল বহু বিতর্কিত গান্ধী-আরউইন চুক্তি। সমসাময়িক বিবরণ ও কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে এই চুক্তির বিষয়টি নিয়ে দারুণ মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। করাচী কংগ্রেসে বাঙ্গলার অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যতীন্দ্রমোহনও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এই কংগ্রেসে দিল্লী-চুক্তি অনুমোদনের জন্য যে প্রস্তাবটি জওহরলাল উত্থাপন করেন, সেটির সমর্থন করে যতীন্দ্রমোহন একটি স্মরণীয় বক্তৃতা

১। সুভাষচন্দ্র বসু তখন কলিকাতা পৌরসভার মেয়র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

করেন। তাঁর সেই দৃপ্ত বক্তৃতার ফলেই জওহরলালের প্রস্তাবটি তুমুল বিরোধি সত্ত্বেও গৃহীত হয়।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, করাচী কংগ্রেসের ঠিক প্রাক্কালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামল শেষ হয়। এই মামলারই অন্যতম অভিযুক্ত যতীন দাস তেষট্টি দিন অনশনে পর লাহোর কারাগারে মারা যান। যতীন দাস বঙ্গবাসী কলেজে নৃপেন্দ্রচন্দ্রে অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মচরিতে যতীন দাসকে ম্যাকস্যুইনির স তুলনা করেছেন। কেওড়াতলা শ্মশানে এই শহীদের শেষকৃত্য যখন সম্পন্ন ত তখন সেখানে নৃপেন্দ্রচন্দ্র একটি দৃপ্ত ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তাঁর সেই ভাষণে শেষে তিনি যখন আবেগময়ী কণ্ঠে বলেন: 'বাংলার তরুণদের আমি বল তোমরা এই শহীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ভুলো না'—তখন সমবেত তরুণদে চিত্তে এক তুমুল উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবিক বহু মঞ্চের ব নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বক্তৃতার মধ্যে এমন একটি ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ থাকত যা শ্রোতার ম প্রাণকে সহজেই অভিভূত করত। এই গুণেই তিনি সেদিনকার বাঙ্গলার যুবক ছাত্রদের মনে এক অনন্যলব্ধ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই সময়ে চট্টগ্রামে একটি ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে স্থানীয় হিন্দুদে উপর যথেষ্ট নির্যাতন হয় ও অনেক হিন্দু গৃহস্থের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। বাজা অনেক হিন্দু দোকান লুণ্ঠিত হয়। কলিকাতায় যখন এই সংবাদ এসে পৌঁছল তখ এ্যালবার্ট হলে জনসাধারণের একটি সভায় চট্টগ্রাম হাঙ্গামার জন্য স্থানীয় সরকা অফিসারদের আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়। ঐ সভায় কংগ্রেস থেকে যে তদ কমিটি গঠিত হয়েছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্র তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। অন্যান্য সদস্যদে মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন, নিশীথচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, যতীন্দ্রমোহ দাসগুপ্ত ও আস্রাফ উদ্দীন চৌধুরী। 'সপ্তাহকালের মধ্যে তদন্ত শেষ ক আমরা কলিকাতায় ফিরে এলাম। চূড়ান্ত রিপোর্টটি, সংগৃহীত প্রমাণের উপ ভিত্তি করে, রচনা করেন তুলসীচরণ গোস্বামী যিনি তখন কংগ্রেসের প্রথম সারি একজন নেতা ছিলেন। আমরা সকলে সেই রিপোর্টে স্বাক্ষর প্রদান করি সংবাদপত্রে সেটি প্রকাশিত হয়। টাউন হলে কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি জনসভ হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেই সভায় পৌরোহিত্য করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে আমরা দুজন ছিলাম—যতীন্দ্রমোহন ও আমি।'

চট্টগ্রামের এই ঘটনার পর নৃপেন্দ্রচন্দ্র কলকাতায় যে কয়টি বক্তৃতা করেছিলে

[১] কেন জানি না, নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন নি।

তার ফলে রাজদ্রোহের দায়ে তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বিচারে তাঁর নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এটা ছিল তাঁর জীবনে তৃতীয় কারাদণ্ড। সাতমাস পরে ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি কারামুক্ত হন। এইখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উপর যবনিকা নেমে আসে। রাঁচীতে বন্দীদশায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু এই সময়কারই (২২ জুলাই, ১৯৩৩) ঘটনা।[১] কারাগারে থাকতেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই দুঃসংবাদে যে যারপরনাই মর্মাহত হয়েছিলেন, আমরা তা সহজেই অনুমান করতে পারি। রাজনীতিতে বহু বিষয়ে মতান্তর সত্ত্বেও, দেশপ্রিয়ের অকাল মৃত্যুতে তিনি কিরকম ব্যথিত হয়েছিলেন তার নিদর্শন হিসাবে তাঁর আত্মচরিত থেকে এই কয়টি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

'J. M. Sen Gupta was a gentleman in the real sense of the term, in the grand old manner,—genial, courteous, affable, nodest, obliging to a fault and thoroughly selfless and exceedingly ourageous on matters of fundamental principle. Five times lected to the Mayoralty of Calcutta, pauperised by unflagging ervice in the nation's cause, Sen Gupta was one of the most utstanding men of the generation that is now almost out moded nd he kept alive till death the flame lighted by his chief C. R. as who had styled him the uncrowned King of East Bangal, as arly as 1921.'

রাজনীতিতে পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ সুবিদিত। তেমনিই যার মতের সঙ্গে তামার মতের ঐক্য হয় না, তার প্রতি মনের মধ্যে বিরূপ মনোভাব পোষণ রা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু নৃপেন্দ্রচন্দ্র যে এসবের বহু উর্ধ্বে ছিলেন তা তাঁর কাধিক সহকর্মী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। মানুষ হিসাবে তাঁর মহত্ত্ব ইখানেই। ১৯৩৩ সালে কারামুক্তির পর তিনি যখন বঙ্গবাসী কলেজের ধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি জানতে পারেন, সরকারী চাপে কলেজের রিচালকমণ্ডলী ইতিপূর্বেই এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে, অতঃপর কলেজে তাঁকে আর রাখা চলবে না। এইভাবেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র কি অধ্যাপক, রাজনৈতিক কর্ম—সবকিছু থেকেই এই সময় অবসর গ্রহণ করে তাঁর বৈষ্ণবাটীর

১। আত্মচরিতে ভ্রমক্রমে দেশপ্রিয়ের মৃত্যু তারিখ আগস্ট মাস বলে উল্লিখিত হয়েছে।

বাসভবনে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। এই সময়েই তাঁর জীবনে একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটে। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুবোধচন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র পঁচিশ বছর। তাঁর বৈদ্যবাটী-জীবন নিঃসঙ্গ হলেও একেবারে কর্মহীন ছিল না।

১৯৩৪। জুন মাস। এই সময়ে একদিন তাঁর এক বন্ধুর কাছে নৃপেন্দ্রচন্দ্র শুনলেন যে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ, স্বনামধন্য হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করেছেন। অধ্যক্ষ মৈত্রকে তিনি গুরুর তুল্য সম্মান করতেন, তাই এই সংবাদ পাওয়ার পর তিনি নিজেই একদিন কলিকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 'অধ্যক্ষ মৈত্র আমাকে বিশেষ অন্তরঙ্গতার সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁর কলেজে অধ্যাপনা করতে রাজী আছি কিনা—অবশ্য আংশিক সময়ের অধ্যাপকরূপে (Part time) হিসেবে। আমি সম্মতি জ্ঞাপন করলাম এবং ১৯৩৪-৩৫ সেসনের জন্য এই কলেজে ইংরেজী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি। এই একটা বছর আমি তাঁর অধীনে এবং অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বেশ সুখে অতিবাহিত করেছিলাম। বেশীর ভাগ দিন আমি বৈদ্যবাটী থেকে ট্রেনে বা বাসে করে কলেজে যেতাম। আমার মনে আছে, এই সময়ে আমি একবার আনন্দমোহন বসু সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেছিলাম; ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং তিনিই সিটি কলেজ স্থাপন করেন।

সিটি কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হওয়ার পরবর্তী ছয়মাস নৃপেন্দ্রচন্দ্র অবসর যাপন করেন। ১৯৩৫ সালের শেষভাগে অথবা ১৯৩৬-এর প্রথমদিকে হুগলী জেলার কংগ্রেসকর্মীবৃন্দ তাঁর কাছে এসে তাদের প্রস্তাবিত জিলা সম্মিলনীর অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ প্রার্থনা করে। রাজনীতি, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিক্ষা এবং কৃষি—এতগুলি বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠিত এই কনফারেন্স খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সেই থেকেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই জেলার কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় জেলার তরুণ কংগ্রেসকর্মীরা সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং তাদের সঙ্গে তিনি সমগ্র জেলায় একাধিক কংগ্রেস-কেন্দ্র পরিভ্রমণ করেন। নিজের শারীরিক ক্লেশ তুচ্ছ করে ঐ বয়সে তাঁর কর্মোদ্যম তাঁর নিবিড় দেশপ্রেমের পরিচায়ক ছিল। গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসকর্মীদের নিষ্ঠা ও নিরলস উদ্যমের প্রশংসা এই প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী এইভাবে করেছেন: 'All honour to them it is these

unknown warriors of the non-violent Congress who have helped in the building of New India, surging with hope and fired with ambition, bringing solace and cheer to millions of sub-men who had been living a drab, cheerless existence, dead to all high aspiration.'

দ্বিধাবিভক্ত হলেও কংগ্রেসের অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান এবং নেতাও অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কয়জন দলের এইসব কর্মীদের সম্পর্কে এমন মুক্তকণ্ঠে বলতে পারেন ? নৃপেন্দ্রচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন এইভাবেই সার্থক হয়েছিল এবং এই গুণেই তো তিনি সমগ্র বাংলাদেশে কংগ্রেসে অমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

১৯৩৪ সালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী যখন সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন তখন কংগ্রেস থেকে এই সম্পর্কে যে 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি অনুসৃত হয়, নৃপেন্দ্রচন্দ্র তা সমর্থন করতে পারেন নি। বরং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয় তিনি তার সামিল হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয় এবং নতুন ভারত আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিতে ১৯৩৬ সালে নির্বাচন হবার কথা। কংগ্রেস এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়। তাঁর অনেক সহকর্মী নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে হুগলী জেলা থেকে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি সম্মত হন নি। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হ'লে পরে দেখা গেল যে এগারটি প্রদেশের মধ্যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। অতঃপর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি দখলের জন্য বিপুল চেষ্টা চলতে থাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নৃপেন্দ্রচন্দ্র কংগ্রেসের এই প্রয়াসের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং বৈদ্যবাটীর জনসাধারণের অনুরোধে স্থানীয় পৌর সভার নির্বাচনে সদলে জয়লাভ করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২—এই চার বৎসরকাল তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪২ সালে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করে পৌর রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

তিনি চেয়ারম্যান হওয়ার পর বৈদ্যবাটী পৌরসভার রূপান্তর সাধন কতখানি হয়েছিল সেই কথা বলতে গিয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন : 'We took office in November 1938 and set about reforming the municipal affairs and eradicating corruption, nepotism and bribery. The municipal

schools were improved ; there was a determined drive at road-making, improvement of the dispensary and provision of medical relief, opening of a new eye and dental sections and of preliminary examination of lung diseases. The tax-payers appreciated the improvement in municipal administration.'

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ত্রিপুরী কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদের জন্য দ্বিতীয়বার প্রার্থী হন ও বিপুল ভোটে গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বলেছেন যে, কেবলমাত্র সুভাষচন্দ্রের পার্শ্বে থাকার জন্যই তিনি একজন সাধারণ প্রতিনিধি হিসাবে ত্রিপুরী গিয়েছিলেন। পরবর্তী কাহিনী সুপরিচিত। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে সুভাষচন্দ্র যখন তাঁর নতুন রাজনৈতিক দল—ফরওয়ার্ড ব্লক—গঠন করেন, নৃপেন্দ্রচন্দ্র তার প্রথম সভ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এই সময়ে 'সুভাষ ধনভাণ্ডার' নামে যে সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল, 'বৈদ্যবাটী জনসাধারণের পক্ষ থেকে নৃপেন্দ্রচন্দ্র পাঁচশত টাকা সংগ্রহপূর্বক উক্ত কমিটিতে দান করেন।

১৯৩৯ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু মুখ্যত রাজনৈতিক কারণে দশমাসের বেশি তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। সরকারী সাহায্যপুষ্ট একটি কলেজে তাঁর মতো একজন খাঁটি কংগ্রেসীর পক্ষে নির্বিবাদে কাজ করবার বহুবিধ অসুবিধা ছিল। কলেজের অধ্যক্ষ রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবেন, একথা মানলেও তিনি একমুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারতেন না যে, তিনি সর্বতোভাবেই একজন কংগ্রেসী (That I was a Congressman first and last)। বাগেরহাট থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আবার বৈদ্যবাটী পৌরসভার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২ সালে পৌরসভার কাজ থেকে অবসর নিয়ে পরিজনবর্গের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র দুই বৎসরকাল (১৯৪৩-৪৫) দেওঘরে অবস্থান করেন। এর পর তিনি চার বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তারপর ১৯৪৯ সালের ১৮ই আগস্ট তাঁর বৈদ্যবাটীর বাসভবনে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে নৃপেন্দ্রচন্দ্র লোকান্তরিত হন। যে স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবনের সুদীর্ঘকাল তিনি কংগ্রেসের পতাকাতলে সংগ্রাম করেছিলেন, সুখের বিষয়, মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে তিনি সেই স্বাধীনতার অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

মানুষ নৃপেন্দ্রচন্দ্র

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবন পরিক্রমা শেষ হ'ল। এইবার মানুষ নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কথা। আমরা দেখলাম তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে বাঙলার বিশাল ছাত্রসমাজে তাঁর প্রভাব কী অসামান্য ছিল সেই কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজের তাঁরই এক প্রাক্তন ছাত্র লিখেছেন: তিনি যে আর সকল হইতে স্বতন্ত্র—কেবলমাত্র অধ্যাপক নহেন, ইহা আমরা অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম। আপনাকে তিনি পুস্তকের প্রাচীরের আড়ালে অচল গাম্ভীর্যের মধ্যে দুর্লভ করিয়া রাখিলেন না। সকলের মধ্যে আপনাকে অতি সহজে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁহার। দুই দিনেই তিনি আমাদিগকে আপনার করিয়া লইলেন।...যে আগুনের শিখা তাঁহার মধ্যে জ্বলিতেছিল সেই আগুন তাঁহার ছাত্রদের মগজের মধ্যে জ্বলিয়া উঠুক আর সেই জ্ঞানাগ্নির শিখায় তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যাক ইহা তিনি মনেপ্রাণে কামনা করিতেন। তাঁহার ছাত্ররা বই পড়িয়া কেবলমাত্র পণ্ডিত হইবে ইহা তাঁহার কাম্য ছিল না। তাঁহার নিজের জীবনের মধ্যে ছিল একটি দুর্দমনীয় গতিবেগ। সেই গতিবেগ তিনি তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছিলেন।' এই গুণেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছাত্রদের অত প্রিয় ছিলেন।

যাঁরা তাঁর জীবনের পরিধির মধ্যে এসেছিলেন তাঁরা দেখেছেন যে, এই অজাতশত্রু মানুষটির চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি কোন প্রকার বাধা বিপত্তিতে বিচলিত হতেন না। তাঁর স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় সকলেই পেয়েছিলেন। এমন স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন তিনি যে কারও কাছে মাথা নত করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অথচ তাঁর প্রকৃতির মধ্যে কিছুমাত্র রুক্ষতা বা উষ্ণতার লেশমাত্র কেউ কখনও দেখে নি। তাঁর এই চারিত্রিক দৃঢ়তা কর্মজীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হ'ত। তিনি যখন রাজনীতির মধ্যে ছিলেন তখন তাঁর সহকর্মীরা যেমন, তেমনিই বিদেশী রাজপুরুষবৃন্দ—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে পুলিশ সুপার পর্যন্ত সকলেই—নৃপেন্দ্রচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতেন। তাঁর জীবনে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। কংগ্রেসের তিনি সভ্য ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন সত্য কিন্তু অন্ধভাবে তিনি দলের অনুসরণ কখনও করেন নি। নিজে একজন নিষ্ঠাবাদী গান্ধীপন্থী হওয়া সত্ত্বেও, গান্ধীবাদের সবটাই যে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বা সমর্থন করতেন এমন কথা বলা চলে না। আসল কথা,

তিনি ছিলেন একজন জন্ম-বিপ্লবী। তাইতো গান্ধীর অসহযোগ মন্ত্রকে উপলক্ষ ক'রে যখন দেশমাতৃকার আহ্বান এল তাঁর কাছে, তখন কি অমন উচ্চবেতনের সরকারী চাকরি, কি স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা, কিছুই তিনি গণনার মধ্যে আনেন নি। রাজশক্তির ভ্রূকুটি, নির্যাতন, অনশন, দারিদ্র্য—সবকিছু জেনেশুনেই তিনি স্বাধীনতার দুর্গম পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু একবার সেই কণ্টকাকীর্ণ পথের যাত্রী হয়ে তিনি আর কখনও পশ্চাৎ দিকে ফিরে তাকান নি।

শুনেছি তাঁর অনুরাগিবৃন্দ তাঁকে ভাবপ্রবণ মানুষ বলতেন। ভাবপ্রবণ তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন, হয়ত একটু বেশিমাত্রায় ছিলেন। তা নইলে জীবনের সমস্ত উপভোগ্য জিনিসকে বিসর্জন দিয়ে দেশসেবায় ঝাঁপ দিতে তিনি পারতেন না। এই ভাব বাঙালীর স্বভাবধর্মের বৈশিষ্ট্য। এই ভাবের তাড়নাতেই আমরা দেশবন্ধুকে একদিন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য থেকে পথের ধূলায় নেমে আসতে দেখেছি। কাজেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র ভাবপ্রবণ মানুষ ছিলেন বললে তাঁর প্রতি কিছুমাত্র অসম্মান হয় না। বলেছি তিনি গান্ধীবাদী ছিলেন। প্রথমবার কারামুক্তির পর তিনি যখন 'সারভ্যান্ট' পত্রিকার সম্পাদনা গ্রহণ করেন তখন ঐ জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকাগুলির মাধ্যমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র গান্ধীজীর আদর্শ ও নীতির যে রকম বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান দিতেন তা পাঠ করে সকলেই মুগ্ধ হতেন।[১]

প্রখ্যাত কংগ্রেসকর্মী নগেন্দ্রকুমার গুহরায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি এই মানুষটি সম্পর্কে একটি চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন। সেটি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম: 'রাজনীতিক্ষেত্রে সম্মানিত পদ পাইবার যথেষ্ট দাবী ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কস্মিনকালে উহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করেন নাই, কিংবা তজ্জন্য কোন নেতার মনস্তুষ্টি সাধনে চেষ্টিত হন নাই। এই কার্যকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। গান্ধীবাদীর মধ্যে এমন এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লবীদলের বিরাট অবদানকে পারতপক্ষে স্বীকার করেন না, এমনকি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই অতুলনীয় দানকে উপেক্ষা করিবার চেষ্টাও করিয়া আসিয়াছেন। গান্ধীজীর অনুগামী হইলেও নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন তাঁহাদের বিপরীত। মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লবীদের বিরাট অবদানকে যথোচিত মর্যাদা দিতে তিনি কোনও দিন দ্বিধা করেন নাই।'[২]

১ পরে *Gandhism in Theory and Practice* বইয়ে মুখ্যত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন-এর) মহাশয়ের প্রস্তাবে মাদ্রাজের *Ganesh & Co.* ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

২ নৃপেন্দ্র স্মরণে: আনন্দবাজার পত্রিকা. ২৮. ৮. ৪৯।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের প্রথম ইংরেজী গ্রন্থটির নাম 'The Ideal of Swaraj'—এটি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছেন। এর ভূমিকায় সি. এফ. এণ্ড্রুজ লিখেছেন যে, এই গ্রন্থের লেখকের সঙ্গে গত পনের বৎসর কাল আমার বন্ধুত্ব। সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থটির উপসংহারে লেখক বলেছেন: 'Today is for the armed man with brute strength and might, the last relic of an age that shows on certain sides signs of a relapse into barbarism. Tomorrow for the spiritual man, the man of intelect and heart, appealing at all times for victory to the forces of the soul.' এখানে একদল দূরদ্রষ্টা মনীষীর মতো নৃপেন্দ্রচন্দ্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই দুটি যুগের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা যেমন সুচিন্তিত তেমনই ইতিহাসসম্মত সত্য। তাঁকে তাই একাধারে কর্মীপুরুষ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বলতে বাধে না।

স্বদেশব্রতী নৃপেন্দ্রচন্দ্রের আর একটি পরিচয় ছিল—তিনি ভাবুক, রসিক ও কবি ছিলেন। ভাবরসের দ্বারা স্বদেশকে রঞ্জিত করে দেখবার সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না, তাঁর জীবনে যে এই সৌভাগ্য ঘটেছিল তার নিদর্শন বহন করে তাঁর রচিত 'কারার ফুল' নামক একটি অনুপম কাব্যগ্রন্থ। এই কবিতাগুলি তিনি কারাগারে বসে রচনা করেছিলেন। বইটি দুটি স্তবকে প্রকাশিত হয়—প্রথম স্তবকটির নাম 'সন্ধ্যামালতী' ও দ্বিতীয় স্তবকটির নাম 'রক্তজবা'। প্রথম স্তবকের বিষয়বস্তু নারী এবং প্রেম আর দ্বিতীয় স্তবকের বিষয়বস্তু জাতীয়ভাব এবং জীবন দর্শন। নিবেদনে বলা হয়েছে: এই কবিতাগুচ্ছ পেশাদার কবির মত নহে। নানা সুখদুঃখ, বিপত্তির জালে জড়িত রাজবন্দীর জীবনের অবকাশের আওতায় একটি পরিণত ঋজু হৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত বেদনা ও আনন্দের স্বচ্ছ প্রকাশ মাত্র। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর এই কর্মকালের মধ্যে এইগুলি রচিত হইয়াছে। দেশভক্ত কারারুদ্ধ বহু বন্ধু কারাবাসে এই কবিতা শুনিয়াছেন এবং ১৯৩০ সালের শেষভাগে কারার বাহিরে অনেক কয়টি জনবহুল সভার কাব্যামোদী বহু সহৃদয় ব্যক্তির নিকটে, ইহার অনেকগুলি কবি নিজমুখে আবৃত্তি করিয়াছেন।' প্রথম স্তবকটি তিনি তাঁর সহধর্মিণীর নামে উৎসর্গ করেছেন আর দ্বিতীয় স্তবকটি বিপ্লবী নায়িকা শান্তি দাসের নামে। 'কারার ফুল' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম কবিতাটির নাম 'রক্তজবা'। এই কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবক এখানে উদ্ধৃত হ'ল।

'শক্তিপূজার বোধন-ঘটের মন্ত্রসিদ্ধ রক্তজবা,
শ্মশান-কালীর মশান-তন্ত্রের রক্তনৃত্যে বক্ষশোভা।
সৃষ্টি-ব্যথার হিয়ার মূলের শোণিত-রাঙা রক্তফুল
প্রলয়-সিন্ধুর উর্মি-ফেণার রক্ত-হাসির রাঙা-দুল।
পাগলা শিবের বেতাল নাচে জাগলে তুমি অট্টহাসে,
উমার তপের পূজায় অর্ঘ্য হিঙ্গুল-রাঙা রক্তাকাশে।
রক্ত-সূতার মুণ্ডমালে অস্থিহারে খর্পর হস্তা
অকালবুকে মহাকালী! রুধির-স্নাতা ছিন্নমস্তা।'

'জীবন ও মৃত্যু' শীর্ষক কবিতায় পাই কবিমনের নিবিড় উপলব্ধি :

'জীবন আমার দুলকি মেঘে কাঁদন সুরের হাওয়া,
ঝড়ের রাতের অভিসারে বাদ্‌লা পথের নেশা;
মৃত্যু আমার রাসের লীলা, নীপের কাঁপন-ছাওয়া
পূর্ণিমার মিলনের দোল্‌না সর্বনাশা!
জীবন সে যে পূর্ণতার অপূর্ণে বিলাস,
মরণ সে যে অপূর্ণেরি জোয়ার-উছাস!'

'রক্তজবা' স্তবকে ভারতের কয়েকজন বরণীয় মহাপুরুষ ও বিপ্লবী সম্পর্কে চৌদ্দটি সনেট আছে। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, অরবিন্দ, আশুতোষ, দেশবন্ধু, যতীনদাস, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র শীর্ষক সনেটগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় এঁদের জীবন ও জীবন-দর্শন সম্পর্কে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কী গভীর অনুভূতিই না ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়তম কবি ছিলেন; শিক্ষকজীবনে ক্লাশে লেকচার দেবার সময় তিনিই প্রথম রবীন্দ্র-কবিতাকে কলেজের ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সনেটটি এইরকম :

'রহস্যের অশ্রুবাণী অনাদিকালের বাজে তব স্বর্ণ-বীনে,
কবিগুরু; তোমার পূরবী-তানে ভাবপুষ্পে ভরিল আকাশ,
ইন্দ্রধনু-নন্দা যত বেদন-মায়ায়; আবেশের মথিত নিক্কনে
বাজে গাহে সুখে দুখে মানব বুকের কত অস্ফুট উছাস,
গোষ্ঠ-জায়া, রাস-লীলা, প্রেম-অভিসার যত বিরহ উজল,
কত বাদলের ডাক গন্ধে-বর্ণে-ভরা কত সূর্যাস্ত-চাতুরী,

বসন্তের অশ্রুমাল্য, দিগ্বধূর আঁখি-সুধা শিশির উছল,
গোলাপের রক্ত-আশা, শেফালির বেদনার ভাষা, মাধুরী
কত না ভাসা মেঘে মাঠে শরৎ-প্রভাতে আর হেমন্ত-নিশায় ।
ইঙ্গিত আভাস যত বিদ্যুৎ-শিখায় আর জোনাকির বুকে
ললাটে উদার উষার স্বর্ণ-কিরীটিনী, সন্ধ্যার তৃষায়
ধরণীর বৈরাগ-গৈরিকে, বর্ষামুখে তটিনীর কলকণ্ঠ সুখে !
সৃষ্টির বেপথু-উৎসে তুমি ফোটা ফুল, আনন্দ-বিলাসী
প্রলয়ের অগ্নি, সামগান অভীমন্ত্রে বনে তব তপঃসিদ্ধ বাঁশী ।'

রবীন্দ্র-বন্দনা বাঙ্গলার বহু কবিই করেছেন, কিন্তু একটিমাত্র সনেটের আধারে রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তিকে এমন সুন্দরভাবে আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। নৃপেন্দ্রচন্দ্র যদি রাজনীতি না করে কাব্যচর্চা করতেন, তাহলে বাঙ্গলা সাহিত্য যে একজন যথার্থ সাহিত্য-সেবক ও কবিকেও লাভ করতো তারই স্বাক্ষর আছে তাঁর 'কারার ফুল' কাব্যগ্রন্থের দুইটি স্তবকের মধ্যে।

ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষ ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। একটি উন্নত ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি যা অন্যায় মনে করতেন, তার কাছে নতিস্বীকার করতেন না এবং এই কারণেই কর্মজীবনে একাধিকবার সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছে। কথিত আছে তিনি যখন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করতেন তখন তিনি তাঁর সতীর্থদের বলতেন—কারো চোখরাঙানীর ভয় আমি করি না। আমার পকেটে সর্বদাই পদত্যাগপত্র রক্ষিত থাকে। এই তেজস্বিতাই তাঁর চরিত্রকে একটি আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছিল। অথচ এই মানুষটির মধ্যে কোন উগ্রতা ছিল না। তাঁর সরলতা ছিল সহজ, আন্তরিকতা স্বচ্ছ। তাঁর দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হ'তো তাঁর চারিত্রিক নির্মলতা ও দৃঢ়তা এবং তিনি আজন্ম বিপ্লবী ছিলেন ব'লেই তাঁকে সর্বদা অস্থিরচিত্ত দেখা যেত। উনিশ শতকীয় বাঙ্গালী জীবনের ও বাঙ্গালী চরিত্রের এই রকম বহু বৈশিষ্ট্য দ্বারা মণ্ডিত ছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সত্তা। তেমনিই তাঁর মানসলোক গঠনে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা যে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল তা তাঁর আচার-আচরণে, চিন্তায় ও কর্মে অভিব্যক্ত হ'তো। বাঙ্গলার তরুণদের তিনি যখন ক্লীবতা ও কাপুরুষতা পরিহার ক'রে, দেশের সেবায় মনপ্রাণ সঁপে দেবার জন্য আহ্বান জানাতেন তখন যেন মনে হতো তাঁর কণ্ঠে সেই ভারতপ্রেমিক সন্ন্যাসীর অগ্নিগর্ভবাণী ঝঙ্কৃত হচ্ছে। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এই তিনটি :—১। সত্যভ্রষ্ট

হইও না। ২। দেশকে ভালবাস ও বড় কর। ৩। দেশের জন্য কিছু ত্যাগস্বীকা কর এবং বিশেষ করিয়া দীনদরিদ্রের ও চাষী-মজুরের সেবা কর।

পরাধীনতার নাগপাশের মধ্যেও একজন মানুষ কেমন করে নিজে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারে, আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনেতিহাস তার প্রমাণ। জ্ঞান, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সমাবেশে গঠিত এই জীবন থেকে তাঁ উত্তরপুরুষ, বিশেষ বাঙ্গলার ছাত্র ও যুবসমাজ, যদি সাহিত্যাগ্নি চয়ন করতে পা তবে এবং তাঁর চিন্তা ও আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হতে পারে তাহলে সেই লোকোত্তর জীবনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন যথার্থ হবে। বৈদ্যবা হাতিশালার মহাশ্মশানে পঁচিশ বছর আগে যাঁর নরদেহ ভস্মীভূত হয়েছিল, সে আজীবন কংগ্রেসসেবী, স্বদেশব্রতী ও ছাত্রবৎসল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবন থেকে তাঁ স্বজাতি যদি মহৎভাব ও আদর্শের—যে ভাব ও যে আদর্শ ছিল সর্বতোভাবে এ শুচিস্নিগ্ধ নৈতিকতা দ্বারা পরিশীলিত—দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতে পারে তবেই ন বর্তমানের সার্বিক অবক্ষয় থেকে তাদের উদ্ধারপ্রাপ্তির আশা আছে। আত্মদানে মহিমায় মহিমান্বিত ছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবন। বাঙ্গলার বৈষ্ণব শাস্ত্রের কথা— 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাইব।' এই জন্মবিপ্লবী ও একনিষ্ঠ অসহযো আমাদের সামনে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, নিরবধিকাল হয়ত সে দৃষ্টান্তকে ধরে রাখতে পারবে না, কারণ কালস্রোতে সবকিছু ভেসে যায়, কি আগামীদিনের বাঙ্গালী কি নিজেদের জীবনে তা রূপায়িত করতে পারবে না আমরা আর কিছু না পারি এই মানুষটির জীবন থেকে অন্তত দুটি জিনিস শিক্ষ করতে পারি—চরিত্র ও ত্যাগ। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কথা স্মরণ হলেই প্রাণোজ্জ্বল একা ব্যক্তিত্বের—ইংরাজিতে যাকে বলা হয় a vital personality—চিত্র আমাদে স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ সেই প্রাণ যা নিঃশেষে দান করেও ক্ষয়প্রা হয় না। এমন জীবনের অধিকারী ছিলেন বলেই না এই আপনভোলা, সরল উদার ও তেজস্বী মানুষ তাঁর স্বজাতির জীবনকে সকল দিক দিয়ে মহিমান্বিত করে গিয়েছেন। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নিজের কথায় শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে তাঁর স্মৃতি-তর্পণ করে বলি :—

অন্তর মাঝারে রচা তব সিংহাসন
হে পূজারী অনবদ্য, অক্ষয় অব্যয়!
হে নির্ভীক, লহ আজি লহ উপায়ন
মৃত্যুর ওপার হতে, অমৃত অভয়
তব বাণী সঞ্চারিছে দিকে দিকে।